মৈমনসিংহ-গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা ১৩২২-২৪]

[পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা]

(তৃতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক এবং
প্রধান পরীক্ষক ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," "রামায়ণী কথা,"
প্রভৃতি বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ-প্রণেতা

রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি.লিট.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

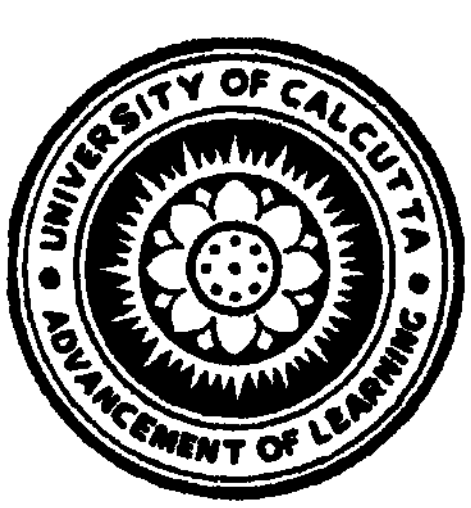

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮

মূল্য ১২৲

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SUBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1918 B.T.—July, 1958—B

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এই পালাগানগুলি সংগৃহীত হইত না,
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর দুর্দ্দিনেও যিনি উচ্চশিক্ষাকল্পে
আমাদের প্রযত্ন একদিনের জন্যও শিথিল হইতে দেন নাই,
সেই অপরাজেয় কর্ম্মবীর, বঙ্গ-ভারতীর আশ্রয়তরু,
জ্ঞানরাজ্যের কল্পবৃক্ষ

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি.এস.আই.,

এম.এ., ডি.এল., ডি.এস-সি., পি-এইচ.ডি.

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'

অর্পিত হইল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বিষয়সূচী

	কাব্যের নাম			পত্রাঙ্ক
	ভূমিকা	---	---	৵০-২৵০
১।	মহুয়া	---	---	১-৪২
২।	মলুয়া	---	---	৪৫-১০০
৩।	চন্দ্রাবতী	---	---	১০৩-১১৮
৪।	কমলা	---	---	১২১-১৭০
৫।	দেওয়ান ভাবনা	---	---	১৭৩-১৯১
৬।	দস্যু কেনারামের পালা	---	---	১৯২-২৩৬
৭।	রূপবতী	---	---	২৩৯-২৬০
৮।	কঙ্ক ও লীলা	---	---	২৬৩-৩১২
৯।	কাজলরেখা	---	---	৩১৫-৩৪৭
১০।	দেওয়ানা মদিনা	---	---	৩৫১-৩৮৭

চিত্রসূচী

চিত্র		পত্রাঙ্ক
পলায়ন	---	১৭
অসময়ে নিদ্রা	---	৫৪
কাজীর কাজ	---	৭২
পূর্ব্বরাগ	---	১০০
লুকাইয়া দেখা	---	১২৬
লুট	---	১৮৪
মন্ত্রৌষধি	---	২৩৩
জেলেদের কথা	---	২৫৩
দুঃসংবাদ	---	২৮৩
কঙ্কণ দাসী	---	৩২৭
কবরের পার্শ্বে	---	৩৮৪

ভূমিকা

১। এই গাথাসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে

১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রাচীন মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্ম্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপূর; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।

এই চন্দ্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল আমার চিন্তার বিষয়। 'সৌরভ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আমার পুরাতন বন্ধু। আমি চন্দ্রকুমারের সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, চন্দ্রকুমার একটি দরিদ্র যুবক, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে এবং তিনি একেবারে কাজের বাহিরে গিয়াছেন।

এই ছড়াটির কথা চন্দ্রকুমার এমনই মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে, উহাতে আমি তাঁহার পল্লীকবিতার প্রতি উচ্ছ্বসিত ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি মৈমনসিংহের অনেক লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই তথাকার পল্লীগাথার আর কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন? আপনি এই ছেঁড়া পুথি ঘাঁটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।"

কিন্তু আমি কোন অজানিত শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কোন্ দিন পল্লীদেবতা আমার উপর তাহার অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিবেন এবং কবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষে মৈমনসিংহের এই অনাবিষ্কৃত রত্নখনির সন্ধান পাইব—ইহাই আমার আরাধনার বিষয় হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিলেন,—চন্দ্রকুমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার আরও চিকিৎসার দরকার।

স্ত্রীর দুই-একখানি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া চন্দ্রকুমার পাথেয় সংগ্রহ করিলেন; এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পূর্ব্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রোগে-দুঃখে জীর্ণ,—মুখ পাণ্ডুরবর্ণ,—অর্দ্ধাশনে-অনশনে বিশীর্ণ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাষী; তিনি পল্লীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত পল্লীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাঁহাকে আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল।

এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন, এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিলেন। আমি তাহার সংগৃহীত পল্লীগাথা সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়া একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, তাঁহাকে এই ভরসা দিলাম।

চন্দ্রকুমার এইভাবে কতকদিন এখানে কাটাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবান্‌ই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, বিল ও পুষ্করিণীতে পদ্ম ও কুমুদের কুঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলিত—এই সকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না। কিন্তু লোকের রুচি এই দিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্য-কথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি,—নানা গ্রামে পর্য্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার উদ্ধার করিতে পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।

প্রথমতঃ চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। মুক্তারামের 'দুর্গাপুরাণ', রামকান্তের 'মনসার ভাসান',—'উমার বিবাহ', 'শিবদুর্গার কোন্দল', 'দুর্ব্বাসার পারণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' এবং 'নরমেধ-

যজ্ঞ' প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের উপরই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। যদিও পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অন্তরের ভালবাসা দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যগুলির পার্শ্বে সেগুলি সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষে ম্লান বোধ হইত, এজন্য সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিষ-গুলিকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে সভ্যগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন। বানিয়াচঙ্গ, জঙ্গলবাড়ী, রোয়াইলবাড়ী প্রভৃতি নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে হাসি পায় . . . . পয়ারের শেষ ভাগে প্রায়ই মিল নাই। এগুলি সংগ্রহ করিব কি?" অন্য একবার গ্রাম্য ভাষার কিছু নমনা দিয়া লিখিয়াছিলেন "এই ভাষার সংগ্রহ করিব কি না আমাকে সত্বর লিখিয়া জানাইবেন।" কিন্তু তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনসিংহ-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ এবং উমা-মেনকাসম্বন্ধীয় কবিগানের প্রাচুর্য্যের ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও তাঁহার এই উৎসাহ আমি খুব সতেজ হইতে দেই নাই। সেই যে অবজ্ঞাত 'অশিষ্ট' ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলক্ষ্মীর প্রাণটি ধরা দিয়াছে, সেই ছড়াগুলির উপরই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাষার সোনার পিঞ্জরে তোতা পাখীর স্থান হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টিবাদলে আকাশের মুক্ত আঙ্গিনায়ই কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাপাইয়া উঠে।

'সৌরভ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে চন্দ্রকুমারবাবু বিচিত্রভাবে নানা দিক্ দিয়া সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 'সৌরভে' তিনি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। 'সৌরভে' চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে 'লোহার মাঞ্জাস' নামে একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য, ইহা চাঁদ সদাগর এবং বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী। ইহার সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত লেখা আছে। শেষ করিতে পারি নাই। সেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাস ও গভীর রাত্রে 'লোহার মাঞ্জাস' লিখিতাম।"

কেদারবাবু নানা দিক্ দিয়া ইঁহার সাহিত্যিক চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছিলেন। কিন্তু 'সৌরভে' চন্দ্রকুমারবাবুর প্রবন্ধে প্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। কবিকঙ্কণের 'বিদ্যাসুন্দর' অপেক্ষা কবিকঙ্কণের সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয়-বিরচিত পালাটিই আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া

বোধ হইয়াছিল। চন্দ্রকুমারবাবুর স্বরচিত 'চন্দ্রাবতী'র উপাখ্যান অপেক্ষা নয়ানচাঁদ-বিরচিত 'জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতী'র পালাটি জানিবার জন্যই আমি বিশেষরূপ লালায়িত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, 'সৌরভে' সেই সকল পালাগানের কিছু কিছু নমুনা প্রকাশিত না হইলে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আসার পর আমি চন্দ্রকুমারবাবুকে তাঁহার অন্যান্য সর্ব্ববিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়া শুধু পালাগান-সংগ্রহে মনোযোগী হইতে উপদেশ দেই।

পৌরাণিক উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইতেছে। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে'র পরে রামকান্তের একখানি 'পদ্মাপুরাণ' না পাওয়া গেলেও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ শ্রীহীন হইবে না; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু 'মহুয়া', 'মলুয়া' বঙ্গের অন্যত্র কোথায় পাইব? 'দেওয়ানা মদিনা' 'ফিরোজ খাঁ' প্রভৃতির পালা যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে—এই অপূর্ব্ব জিনিষ বঙ্গসাহিত্যে সুদুর্ল্লভ। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুম্‌কি দেওয়া বেনারশী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধারকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব্ব সুন্দর,—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম। নানা দিক্ দিয়া এই সকল পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন,—উহা হোটেলের মসলা-দেওয়া মুখরোচক বিলাসখাদ্য-সম্ভার নহে, উহা আমাদের পল্লী-অন্নপূর্ণার শ্রীকরকমলের দান—জীবনদায়ী অন্নব্যঞ্জন। এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতা-সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারিব—যেহেতু তাহারা ঘাগরা-পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

চন্দ্রকুমার জীবনে কতটা দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন তাহা শুনিলে কষ্ট হয়। নিম্নে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে দুই একটি-কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

চন্দ্রকুমার ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহে নেত্রকোণার অন্তর্গত আইখর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্যরূপ শিক্ষালাভ করিয়া এক টাকা মাসিক

বেতনে মুদিখানায় কাজ করিতেন। অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী বলিয়া তাঁহার সেই কাজ যায়। তাহার পরে দুই টাকা মাহিনায় তিনি একটি গ্রাম্য তহশিলদারী যোগাড় করেন। এই সূত্রে তাঁহার চাষাদের সঙ্গে অবাধভাবে মিশিবার সুযোগ হয়। চাষারা যখন তন্ময় হইয়া এই সব পালা গাইত, চন্দ্রকুমারও তাহাদের সঙ্গে তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। এইভাবে পল্লীজীবনের মাধুর্য্য ও কবিত্ব তাঁহার মনকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। তিনি এখন এমন সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সুলেখকগণের অনেকের সঙ্গেই তিনি বোধ হয় প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহের গাথা সংগ্রহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পালাগুলি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন :—

১। মহুয়া—দ্বিজ কানাই প্রণীত। ২। মলুয়া—গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত, কেহ কেহ অনুমান করেন চন্দ্রাবতীর লেখা। ৩। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র—নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। ৪। কমলা—দ্বিজ ঈশান প্রণীত। ৫। কেনারাম—চন্দ্রাবতী প্রণীত। ৬। রূপবতী—কবির নাম অজ্ঞাত। ৭। ঈশা খাঁ দেওয়ান—অজ্ঞাত। ৮। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। ৯। মনহর খাঁ দেওয়ান। ১০। দেওয়ান ভাবনা। ১১। ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী—অন্ধ কবি ফকির ফৈজু প্রণীত। ১২। জিরালনী। ১৩। কাজলরেখা—অজ্ঞাত। ১৪। অসমা। ১৫। ভেলুয়া সুন্দরী। ১৬। কঙ্ক ও লীলা—রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ বানিয়া ও নয়ানচাঁদ ঘোষ—এই চারি কবির ভণিতাযুক্ত। ১৭। নদনকুমার ও মধুমালা। ১৮। গোপিনী-কীর্ত্তন—'স্ত্রীকবি সুলাগাইন' কর্ত্তৃক রচিত। ১৯। দেওয়ানা মদিনা—মনসুর বয়াতি প্রণীত। ২০। বিদ্যাসুন্দর—কবিকঙ্ক প্রণীত। ২১ রামায়ণ—চন্দ্রাবতী প্রণীত।

ইহা ছাড়াও অনেক কবি ও যাত্রাগানের পালা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহ এই পর্য্যন্ত ১৭,২৯৭ ছত্রে দাঁড়াইয়াছে।

পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জ্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ছন্দের—শব্দৈশ্বর্য্যের কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়ত বড় বড় তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল। যাঁহারা

লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রু কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না।

উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,—তাহাদের পাদলেহন করিয়া এক দিকে সোমেশ্বরী ও অপর দিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র ক্বচিৎ ভৈরব রবে, ক্বচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্কণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়াকীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে 'হাওর' বলে। 'তলার হাওর', 'জেলের হাওর', 'বাধারার হাওর', প্রভৃতি বহু বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, 'হাওর', 'সায়র' প্রভৃতি শব্দ 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ।

উত্তরে সুষঙ্গ দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র।

২। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের রাষ্ট্রীয় অবস্থা।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের অধীন ছিল। তৎপরে এই প্রদেশ গুপ্ত-শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। কামরূপের শাসনে এই দেশ এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাঙ্গ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজা শশাঙ্কের আহ্বানে এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। চীন-পর্য্যটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজাং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণযোদ্ধা কোচ-রাজবংশীয় বৈশ্য গারো নামক রাজার অধিকৃত সুষঙ্গ-দুর্গাপুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৪৯১ অব্দে সেরপুরে গড়জরিপার রাজা দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ১৫৮০ খৃঃ অঃ ঈশা খাঁ মস্‌নদ আলী জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় করিয়া তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর; বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অপরাপর রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যগুলি পরিশেষে মুসলমানগণের অধিকৃত হয়, অথবা ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া মুসলমানগণের বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ

আত্মরক্ষা করে। ইহাদের বিবরণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার "মৈমনসিংহের ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী দুই-তিন শতাব্দী কাল অপর-এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সেনবংশীয় রাজগণ পশ্চিম-মৈমনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল-সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পূর্ব্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্ম্মে বল্লাল সেন-প্রবর্ত্তিত 'গৌরীদান', আচারবিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ তখনও জাতিভেদ সেই দেশে এরূপ কঠোর হইয়া উঠে নাই। তথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তখন প্রণয়পথে ব্যর্থকাম হইয়া, হিন্দু রমণী আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্বিনী হইতে পারিতেন[১]।

সুতরাং শত শত আচারবিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইনকানুনে-বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুসমাজের যে মূর্ত্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাঁড়া হাতে বর্ত্তমান কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে,—এই পল্লীগাথাবর্ণিত সমাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে ছেলে এক বৎসর বয়স হইতে পূরা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্যপানপূর্ব্বক চাঁড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিত, ব্রাহ্মণকুল-তিলক গর্গ নিজের গায়ের পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ দিনে কি তাহা সম্ভবপর হইত?[২] চাঁড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযমুনার ন্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না। পিতামাতার মত না লইয়া বয়স্কা কন্যা গোপনে নিজে বর মনোনয়নপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠে

[১] কঙ্ক ও লীলা।

[২] কঙ্ক ও লীলা।

মাল্য দেওয়ার গন্ধর্ব্বরীতি এ সমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে[১]। এই পল্লীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম্ম বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু কখনই নারীধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ নারীধর্ম্মের যে জীবন্ত মূর্ত্তিগুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।

৩। এই গীতিসাহিত্যে নারীচিত্র

সুতরাং হিন্দু সমাজের এই অভিনব চিত্রগুলিতে যে জীবন ও আনন্দ পাওয়া যাইতেছে, তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহের ন্যায় শক্তি ও স্ফূর্ত্তিতে ভরপুর। এই অবাধ শক্তি ও আনন্দের বন্যায় ঐরাবতের ন্যায় দুর্জ্জয় বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা প্রাচীন সমাজের আবর্জ্জনাময় পঙ্কিল ডোবা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, এই গিরিনদীর স্ফূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হয়ত আমাদের ভিতরকার জীর্ণ সংস্কারগুলি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে খসিয়া পড়িতে পারে। এই পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা। ইহা আমাদের অন্ধ চক্ষে দৃষ্টিদান করিতে পারে। এই পালাগুলিতে দেখা যায়, আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্য আইনকানুনে এবং আচার্য্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্য প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান্। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুর্ব্বলতার ছদ্মবেশ মাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দুসমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানব-জাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।

এই যে মনের অগাধ অনুরাগ, পল্লীগাথাগুলি পড়িলে দেখা যায় তাহার কি দুর্জ্জয় শক্তি। হাতীর সাহায্যে মর্কট আসিলে, তাহা দেখিলে হাসি পায়। এই অটল নিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি একাদশীর উপবাস ও প্রোষিতভর্ত্তৃকার আইন জারি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সে সোনার উপর গিল্টি করে এবং হীরার উপর রং ফলাইয়া তাহা উজ্জ্বল করিতে চায়। মহুয়ার প্রেম কি নির্ভীক, কি আনন্দপূর্ণ! শ্রাবণের শত ধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে পালঙ্কসখীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত ও অনাড়ম্বর। উহা বাক্যদ্বারা পল্লবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পৌঁছিয়াছে। মলুয়ার পূর্ব্বরাগ, বাসরঘরে স্বামীর সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর—এই সমস্ত কি অপূর্ব্ব! এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং

[১] ভেলুয়া সুন্দরী (দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত), ও দেওয়ান ভাবনা দেখ।

শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্ব্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকে ম্লান করে নাই। সর্ব্বশেষে শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করিও না, তাহাদের কুটিরেই, এই ভগবতী তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দিয়া থাকেন—নতুবা মদিনা, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, ক্ষেতে আইল বাঁধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়া দেওয়া অবধি শত শত ক্ষুদ্র কার্য্যে—জীবনে মরণে—কি নিজ মূর্ত্তিতে ভগবতীর প্রতিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়া দেখায় নাই? এই খণ্ডে সখিনাকে দেখাইতে পারিলাম না,—মলুয়া ও মদিনার পার্শ্বে এই সখিনা মূর্ত্তি যেন পদ্ম ও বেলার পার্শ্বে ফুল্ল গোলাপ। এই বিচিত্র কৃষক-কুটিরের বাগানেও সূর্য্যের আলো ও মুক্ত বায়ুতে স্বর্গীয় সুবাস ও ভাবলোকের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। রাজপ্রাসাদেও তাহা সর্ব্বদা সুলভ নহে।

লীলার লীলাবসান, সোনাইয়ের নির্ব্বাক্ ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, পাষাণময়ী কাজলরেখার চরিত্রে চিরসহিষ্ণুতা, এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি চন্দ্রার তপোদ্দীপ্ত শান্তি, এই চিত্রগুলি দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী। ইহার প্রত্যেকটি মূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজা পাইবার যোগ্য।

কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাঁধি, মুখস্থ-করা শাস্ত্রের গৎ, ইহার কিছুই নাই। পরিণয় আছে কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতীর চেলীর বাঁধের মত তাহা বাহ্যাড়ম্বর নহে। এই গীতিসাহিত্যের উদারমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শত ধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবণের মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্ম্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষী বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালবাসার পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষপান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপূর্ব্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসারবিমুখ, ঊর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় বঙ্গরমণী সমাজদ্রোহী, পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জ্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহের গৃহলক্ষ্মী, সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প-অভিমান নাই, লজ্জার অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী, —কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন,—সমাজের ভ্রূকুটিতে তিনি মর্ম্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর

ব্রহ্মচর্য্য কি, দেওয়ান সাহেবের হাবলিতে তাহা মলুয়া দেখাইয়াছে। মহুয়া ও সখিনা বঙ্গরমণীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। এই দেশের মেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মত কিরূপে অনুরাগে ঝরিয়া পড়ে, লীলা ও মদিনার সেই অনুরাগ মূর্ত্ত। দুঃখ আত্মাকে কিরূপ সহিষ্ণুতা ও ভক্তির বর্ম্মে আবৃত করিয়া রাখে চন্দ্রা তাহা নীরবে দেখাইতেছেন।

৪। বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃতযুগের পূর্ব্বাধ্যায়

শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, এই সকল গাথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক্ স্পষ্ট হইয়াছে। ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, সূর্য্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান, ব্রতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন—প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পঙ্ক্তিতে স্থান হইবে। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা এক ছন্দে এক তানে বাঁধা,—তাহাদের ভাষাগত রচনা ও ভাবগত ঐক্য সকলের চক্ষেই পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমার্জিত বঙ্গের পল্লীকথা এবং 'কোন্ কাম করিল'[১] প্রভৃতি কথার ভঙ্গী, এই সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া আছে।

ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থানে, গিরিনদীর তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদের ভাব ও ভাষা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুঁথিগুলির গ্রাম্য ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরবর্ত্তী সাহিত্যের বিভিন্নতা অতি স্পষ্ট। মনসাদেবীর ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের কয়েকখানি পুঁথির উপর পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা তাহাদের ভাব ও ভাষার উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতযুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়া লইলেন, কিন্তু জোড়া অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া রহিল। চণ্ডীকাব্যের মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীতে গ্রাম্য ভাব ও ভাষার ছন্দটি ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল অকৃত্রিম সরল ভাষার উক্তির মধ্যে হঠাৎ 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' এইরূপ দু-একটি সংস্কৃতাত্মক পদ নির্ঝরগতির মধ্যে শৈলখণ্ডের মত পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর কথাবার্ত্তা, ফুল্লরার সঙ্গে লহনার ঝগড়া; বণিক্‌সভায় মালাচন্দনের উপলক্ষে বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি অংশ খাঁটি প্রাচীন ছড়া, কিন্তু ভগবতীর রূপবর্ণনা, খুল্লনার ছাগলরক্ষার সময়ে বনে বসন্তের আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত একটা

১ পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও অপরাপর প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। লেখার ভঙ্গী তথাপি সর্ব্বত্রই একভাবের। এক ঘটনার পর অন্য ঘটনা বর্ণনা করিতে গেলে এই বিভিন্ন দেশের কবিরা "কোন্ কাম করিল" এই কথা দ্বারা শেষের ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকেন—ইঁহাদের রচনারীতি একরূপ।

মুখোশ পরাইয়া দিয়াছে। বঙ্গপল্লীর দয়েলাটি ময়ূর সাজিয়া বাহির হইয়াছেন। এই সকল মন্তব্য মনসামঙ্গলের প্রতি ও ধর্ম্মমঙ্গলের প্রতিও তুল্যরূপেই প্রযোজ্য।

এই ছড়াগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। তখন সিন্ধবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের মত বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আসিয়া এরূপ দুরন্তভাবে চাপিয়া বসে নাই। এই সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকা—বেনে, সদ্‌গোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমন কি ডোমজাতীয়। ইহাতে ব্রাহ্মণের টোলে বেনে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতেছে, গন্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে গলাধাক্কা মারিয়া সদর দরজার বাহির করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণ্যগৌরবের অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনা-স্বরূপ যজন-যাজন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হইত। পৈতাটা তখনও ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য অঙ্গীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। কোথায়ও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয় ও উপবীত উভয়ই পোষাকী দ্রব্যের ন্যায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত।

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমণ্ডপে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল,, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কান্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি একালের কোন স্থপতি সংস্কার করেন তবে নূতন-পুরাতনে যে বিষম সংযোগ হয়, তাহা চক্ষে ঠেকিবেই। এই রিফুকর্ম্মটা কখনই বেমালুম হয় না। মুকুন্দরাম, বিজয়গুপ্ত, ঘনরাম ও রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ প্রাচীন পালাগুলি লইয়া যে নব্যলীলা খেলিয়াছেন, তাহাতে দুই যুগের ভাব ও ভাষার আদর্শ পৃথক্ হইয়া আছে, তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহাদ্বারা সংস্কৃতপূর্ব্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অঙ্কিত হয়, সেই যুগেই বেহুলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাঁদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, একব্রত, অটল চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূষণ হয়। পরবর্ত্তী কবিগণ পূর্ব্বের সেই কাব্যগুলিকে শোধন করিয়াছেন, ভাষা উজ্জ্বল করিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বযুগের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে স্বল্পাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের হাতে চাঁদ সওদাগরের ন্যায় বীর গৌরব হারাইয়া কতকটা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন।

যে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হইয়াছিল (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে) তখন হিন্দুজাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিল, গুণীর অভাব ছিল না। বাঙ্গালী জাতির আশয় ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ ছিল, বাঙ্গালী বণিক্ সমুদ্রকে রত্নাকর

সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনিয়া মৃদু কান্নার গুঞ্জরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতান্ত শিশুকালেও তিনি পুরুষ ছেলেদের সাথে খেলা করেন নাই। এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল।

পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রেম জিনিসটা কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের আনন্দই উহার পরম তৃপ্তি, ইহা শক্তিপ্রয়োগে পাওয়া যায় না। এই দুর্লভ জিনিসটা হিন্দুর ঘরে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, গীতিকাগুলি পড়িয়া পাঠক নিজে তাহার পরিচয় পাইবেন। এই মৈমনসিংহ হইতেই আমরা মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই কথা-চতুষ্টয় গীতিকথা নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত অপূর্ব্ব 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই গীতিকথার পার্শ্বে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'কাজলরেখা' এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, এটিও একটি গীতিকথা। গীতিকথাগুলি শুধুই উপাখ্যান। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কাজলরেখা ছাড়া অন্য সমস্ত গীতিকাই ঐতিহাসিক ঘটনামূলক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা উভয়েরই আদর্শটা ঠিক একরূপ। উপাখ্যানগুলিতে অনেক আজগুবি কথা আছে, ঐতিহাসিক গাথায় একটিও আজগুবি কথা নাই, প্রভেদ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু উপাখ্যানের কাজলরেখা ও মালঞ্চমালা এক দিকে এবং ঐতিহাসিক মলুয়া ও মদিনা অপর দিকে। প্রেমের রাজ্যে ইহারা সহোদরা। শ্মশানের চিতায় যে সুন্দরী নারী হ্যালিডে সাহেবের সম্মুখে একটা দীপশিখাতে নিজের আঙ্গুলটি ভস্মীভূত করিয়া স্থির অটলমূর্ত্তিতে বলিয়াছিল, "সাহেব, বল ত দেহটা আরও পোড়াইয়া দেখাই। তুমি না বলিতেছ, আমি আগুনের যন্ত্রণা বুঝি না, এইজন্য না বুঝিয়া সহমরণ যাইতেছি।" সেই সুন্দরী রমণী ও মলুয়ায় কি কোন প্রভেদ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তি, আত্মমর্য্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই,—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, সেখানে সে প্রাণ অপূর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই অপূর্ব্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিতে পারে? এইজন্য এই গীতিকাগুলির সর্ব্বত্র দেখা যায় পুরুষ ও নারী নিজেরা বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভেলুয়া সুন্দরী' গাথা প্রকাশিত হইলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে দম্পতী নিজেরাই মাল্যবিনিময় করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁর পালায় সখিনা নিজে দেওয়ানকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া পিতা ওমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

এই খণ্ডেই সোনাই নিজে মাতা ও মাতুলের মত না লইয়াই মাধবকে বররূপে বরণ করিয়াছেন। বিবাহের অনেক পূর্ব্বে কমলা প্রদীপকুমারকে নিজের হৃদয় দিয়া ফেলিতেছেন এবং মলুয়াও সেই ভাবে চাঁদ বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া পড়িতেছেন,—এমন কি চন্দ্রার মত ধর্ম্মশীলা সংযমশীলা তপস্বিনী নারীও বিবাহ-প্রস্তাবনার বহুপূর্ব্বে জয়চন্দ্রকে স্বামিরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন। এই ভাবের ছড়ার এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পৌরোহিত্যের প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-প্রথা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শানুসারে এই প্রথার সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, ইহা কুৎসা ও লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। খুল্লনা ও ধনপতির বিবাহ-পূর্ব্ব প্রেমচিত্রটি মুকুন্দরাম যেন দাঁতে জিভ কাটিয়া কোনরূপে সামলাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন ছড়াটা তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাস রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে পিতামাতা ঠিক করিয়া দেওয়ার পূর্ব্বেই বরকন্যার নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং চৈতন্যপ্রভু বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন এবং শুভদৃষ্টির পূর্ব্বেও দম্পতীর মধ্যে চারি চক্ষের একটা প্রেমদৃষ্টির বিনিময় হইয়াছিল,—তাহার আভাস চৈতন্যভাগবতে আছে। এই পূর্ব্বরাগটাকে সমাজের পাণ্ডাগণ শেষে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে গৌরীদানের প্রথা পুথি হাতে করিয়া জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভূতপূর্ব্বভাবে মৈমনসিংহ হইতে আমরা সমাজের পূর্ব্বাধ্যায়ের কতকগুলি আলেখ্য পাইতেছি। নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে নাই, এইজন্য আদিম আদর্শের গৌরবশ্রী সেখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সকল গীতিকার নায়ক-নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ, পনের এমন কি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিতা দেখিতে পাই। মুকুন্দরাম পুরাতন চণ্ডীর পালার রিফুকর্ম্ম করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন ছড়ায় ছিল যে, খুল্লনা যৌবনে পদার্পণ করিয়া ধনপতি সওদাগরের প্রেমে আকৃষ্ট হন। কি ভয়ানক কথা। নূতন সমাজের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ-কবি একজন পুরোহিতকে উপস্থিত করাইয়া খুল্লনার পিতাকে খুব ধমকাইয়া দিয়াছেন। সাত বৎসরের মেয়ের বিবাহের মহাফল এবং তারপর আট বৎসর, উর্দ্ধে নয় বৎসর,—ইহার পরেও বিবাহ না হইলে যে পিতামাতার অদৃষ্টে ঘোর নরক, শাস্ত্রের বচনসহ পুরোহিতের মুখে কবিকঙ্কণ লক্ষ্মীপতিকে তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহুলাও যৌবনে পদার্পণ করিয়াই লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করিতেছেন, এমন কি নিজে উপযাচক হইয়া এই বিবাহে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন;—বিবাহবাসরে লক্ষ্মীন্দর তাঁহার আলিঙ্গনলিপ্সু হইতেছেন;—এই সকল কথা সংস্কৃতযুগের

কবিগণ প্রাচীন ছড়া লইয়া নাড়াচাড়া করার সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৈমনসিংহ-গীতিকায় যে সকল কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্যত্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরূপ ছিল এবং তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেনরাজগণের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের যে আদর্শ ছিল, তাহা আমরা এমন পরিষ্কারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন অবকাশ নাই।

একমাত্র মহুয়া এই গাথাসাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী—ইহা ঘরেরও নহে, বাহিরেরও নহে। এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্য্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অতি সংক্ষেপে—নাট্যগরিমায়, পর পর কৌতূহলপ্রদ প্রাণোন্মাদী দৃশ্যপরিবর্ত্তনে, নায়ক-নায়িকা অপূর্ব্বভাবে কবিত্ব ও ত্যাগমহিমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা মুক্ত গগনের, সীমাবিহীন পথের পথিক,—মহাণবে ডুবন্ত নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেরূপ ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বর্গীয় পণে অটল। ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম-পারিজাত-স্পর্শে ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইঁহারা কোন গৃহের সম্পর্কিত নহেন, ইঁহারা পরস্পরের প্রতি উদ্দাম অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোন বিধি মানেন নাই,—প্রেম ভিন্ন ইঁহাদের ধর্ম্ম নাই,—পরস্পরের সাহচর্য্য ভিন্ন ইঁহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই। ময়নামতীর গানে বর্ণিত আছে, রাজা গোপীচন্দ্রের অনেক স্ত্রী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের পরে তাঁহারা সকলেই নূতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের অভিনয় করিলেন। ইহাতে অবশ্য কোন দোষের কারণ নাই। সেকালে রাজপ্রাসাদের ইহাই স্থানীয় প্রথা ছিল। একমাত্র অদুনা ঘৃণার সহিত সেই রীতি পদদলনপূর্ব্বক গোপীচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। এই অদুনা আমাদের গীতিকাগুলির নায়িকাদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে বসিবার যোগ্যা।

৬। গাথাসাহিত্যে উর্দ্দু প্রভাব—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ভাব

এই নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথায় উদ্দীপনার ছন্দে তাঁহাদের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। এই সকল গানে কতকগুলি উর্দ্দু শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। গত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমান

উভয়েরই হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আর্‌বি ও পার্‌সি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের জন্য অপরিহার্য্য। আমাদের যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আর্‌বি ও পার্‌সির সঙ্গে তাঁহাদেরও কতকটা তাই। তাহা ছাড়া মুসলমান এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং নানা কারণে, বাঙ্গালা-প্রাকৃতের সঙ্গে কতকটা উর্দ্দুর সংস্রব ঘটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবাসী, আমাদিগের কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভারতের অব্যবহিত পশ্চিমদেশের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহা আমাদের নিত্যকথিত ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটীরে, এমন কি হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না।

কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজনা' তাঁহাদের লেখনীতে 'রাজস্ব'রূপে পরিণত হয়—চিরপরিচিত 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে 'জবরদস্তি' 'বলপ্রয়োগে', 'দুস্তি' 'বান্ধবতায়', 'জমি' 'মৃত্তিকায়', 'আস্‌মান' 'আকাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিমজ্জা বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এক সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ অতিকায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিয়া এই ভাষার পর্ণ কুটীরটিকে ঐরাবতশালায় পরিণত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবে আর্‌বি-পার্‌সির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্য্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন। বস্তুতঃ মুসলমানী বাঙ্গালা ও পণ্ডিতী বাঙ্গালা, ইহাদের কোনটাই বাঙ্গালার স্বরূপ নহে, উহারা আমাদের ভাষার বিদ্রূপ ও একান্ত পরিহার্য্য। ভাষা জিনিষটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জ্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাটলিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত হইতে চায় না।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বহুশতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর ভাষা। এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় উর্দ্দু উপাদান ততটা ঢুকিয়াছে, যতটা প্রকৃত পক্ষে এদেশে আসিয়া বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই

গীতিসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, এখানে পণ্ডিতগণের রক্তচক্ষে শাসাইবার কিছু নাই। লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি, মুসলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, মুসলমান নায়িকা, এবং মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা কবিরা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে স্বাধীন প্রেম-চর্চ্চার সুযোগের অভাব অনুভব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানী আয়েষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা মুসলমান-বিদ্বেষের ফল নহে। ইংরাজী উপাখ্যানের পূর্ব্বরাগ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিতেই হইবে, সুতরাং এক দিকে সমস্ত সমাজবন্ধন-বিচ্যুতা কপাল-কুণ্ডলারূপ অভূতপূর্ব্ব চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, অন্য দিকে মুসলমান সমাজ হইতে আয়েষাকে সংগ্রহ করিয়া লেখকের প্রাণের কামনা মিটাইতে হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু নিজের সুবিধার জন্য সাহিত্যে এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষের চিহ্ন বলিয়া এই ব্যাপারটা ধরিয়া লইয়াছেন। এটি মোটেই তাহাঁদের ভাল লাগে নাই। আজকাল অনেক মুসলমান লেখক বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া হিন্দু রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিণী করিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু মৈমনসিংহের গীতিকায়, সেইরূপ আড়াআড়ির ভাব, বা জাতীয় বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। মুসলমান কবি কালিদাস গজদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, পার্শ্বেই আবার ঈশাখাঁর প্রতি অনুরক্তা কেদার রায়ের ভগিনীর চিত্রটি আছে। আর-একটি গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর-একটিতে সুরৎজমাল ও ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুয়ার প্রেমপ্রসঙ্গ আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত হইলেও আদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকামাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান যে বহুশতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের অত্যাচারের কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা 'মুসলমানী অত্যাচার' বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় হইবে। এই অত্যাচার দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচারীর ব্যভিচার,—ইহার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম বা জাতিঘটিত কোন ঘটনা নহে। এক দিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজীকে শূলে চড়াইয়া দিতেছেন। এক দিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের

মাতুল ব্রাহ্মণকুলগৌরব ভাটুক ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এক দিকে যেরূপ অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা,—অপর দিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী পরস্ত্রীলিপ্সু হিন্দুকুলতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নির্ম্মম মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সর্ব্বত্রই ছিল। যদি রাজা ভাল হইতেন, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকিত না। সোণার ভাটা লইয়া রাইয়তের ছেলেরা খেলিতে থাকিত, কলার পাতা বেচিয়া লোকে পাকা বাড়ী তুলিত, ঘাস-বেচা লোকে হাতী কিনিতে সাধ করিত, লোকে ধনকড়ি যেখানে সেখানে শুকাইতে দিত, ধনরত্ন পথে ফেলিয়া রাখিলেও চোরদস্যুর উপদ্রব থাকিত না। আবার রাজা কি মন্ত্রী অত্যাচারী হইলে রাইয়তেরা তাহাদের বলীবর্দ্দ, লাঙ্গল-জোয়াল এবং ফাল বিক্রয় করিয়াও ত্রাণ পাইত না, অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দুধের ছেলেকে বিক্রয় করিত। বানিয়াচঙ্গের অত্যাচারী দেওয়ান দুলালের কারাগৃহ হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্রূর বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং এই দুর্ব্বলের উৎপীড়ন ইতিহাসবিশ্রুত সনাতন ঘটনা, হিন্দু বা মুসলমানের নামাঙ্কিত করিয়া ইহা জাতিবিদ্বেষ উস্‌কাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ করা উচিত নহে। মুসলমান রাজত্বে, মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী ছিল, এইজন্য হয়ত অত্যাচারীর সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশী ছিল,—কিন্তু সে দোষ ক্ষমতার, কোন শ্রেণীবিশেষের নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিকে অত্যাচারী মুসলমান ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে পৈতা কাড়িয়া লইয়া তাহার মুখে থু থু দিতেছে, অপর দিকে হিন্দু গোপেরা মুসলমান কাজীর দাড়ি উপড়াইয়া তাহার মুখে ছাগের রক্ত মাখিয়া দিতেছে, সুতরাং কেহই কম নহে।

বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের পণ্ডিতেরা এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি, পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্ত্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সকল গাথায় 'হস্তী' (হাতী) শব্দ 'আত্তি', 'বর্ষা' শব্দ 'বাস্যা', 'শ্রাবণ' শব্দ 'শাওন', 'মিষ্ট' শব্দ 'মিডা', 'শিকার' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাষারা এই ভাষায় পাড়াগাঁয়ে কথা কহিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে; আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃতশব্দ সংশোধনপূর্ব্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছি। এই সংশোধন-কার্য্য ভারতচন্দ্র এমন কৌশলের সঙ্গে চালাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা স্তোত্র নাগরী অক্ষরে লিখিলে তাহা নিছক সংস্কৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৭। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের পল্লীগুলি 'সাহিত্যিক তীর্থ'-পদবাচ্য

বাঙ্গালার মাটীর যে কি আকর্ষণ তাহা স্বভাবের খাঁটী সৃষ্টি এই গীতগুলির সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার চাঁপা, বাঙ্গালার নাগেশ্বর ও কুমুদ ফুল, বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে কি সুন্দর দেখায়, এই সাহিত্যের পথে ঘাটে তাহার নিদর্শন আছে। বর্ষার কদম্ব বৃক্ষ, মান্দার গাছের ডালে-ঘেরা কদলী বন, নদীর ধারে কেয়া ফুলের ঝাড়, মুক্তাবর্ষী প্রস্রবণপ্রতিভ বৃহৎ তরুশাখা হইতে অজস্র বকুল ফুলের দান—কাব্যবর্ণিত কর্ম্মশালার মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া আমাদের শ্রম অপনোদন ও চোখের তৃপ্তি ঘটাইয়া যায়। কোথাও বর্ণনার লাঘব নাই, অথচ কৃষকের দৃষ্টি যেরূপ কিছুতেই মাথার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শ্যামল বনরাজি এড়াইতে পারে না, এই কাব্যসাহিত্যের নানা ঘটনার মধ্যে পারিপার্শ্বিক শোভাদৃশ্যগুলিও সেইরূপ পাঠকের অপরিহার্য্য সহচরস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই পূর্ব্ববঙ্গের দৃশ্যাবলি মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের দৃশ্য কিরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিব। চাঁদ বিনোদ ক্ষেত্রে ধান কাটিতে যাইতেছে, প্রথম ধানকাটার পরে বাতা নামক লতার 'ডুগুল' (অগ্রভাগ) দিয়া কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন তৈরী করে,—তাহাতে কয়েক গাছি ধানের ছড়া লক্ষ্মীদেবীকে সর্ব্বপ্রথম উৎসর্গ করা হয়। চাঁদ বিনোদ প্রথম দিন ধান কাটিতে যাইতেছে, দুটি ছত্রে কবি তাহার মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। "পঞ্চ গাছি বাতার ডুগুল হাতেতে লইয়া। মাঠের পানে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।" প্রথম ধান ঘরে আনার স্ফূর্ত্তি বারমাসী গানে ব্যক্ত হইতেছে। "গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিল্‌কি ঠাডা পড়ে" ছত্রটিতে 'জিল্‌কি' ও 'ঠাডা' শব্দের দ্বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণে কিরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনয়ন করিতেছে। ছেলে না খাইয়া বিদেশে যাইতেছে, অতি দুঃখে মাতা তাহার পথের প্রতি সজল দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া আছেন। বাঁশের ঝাড় ও জঙ্গলের ডাল চাঁদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ ছুঁইতেছে,—এইভাবে পুত্র গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন,—এইরূপ বহু দৃশ্যে বাঙ্গালার স্নিগ্ধ কুটীরটি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। "হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে"—কি সুন্দর পদ! তাহা হইতে অপূর্ব্ব 'বৌ কথা কও' পাখীর বর্ণনা। মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত দেহ,—সে দিকে দৃক্‌পাত নাই—পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে 'বৌ কথা কও' বলিয়া অভিমানিনী প্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। "শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। 'বউ কথা কও' বলি কাঁদে পথে

পথে॥" (কঙ্ক ও লীলা, ৩০২ পৃঃ)। এরূপ অনেক পদ আছে, পাঠক নিজে পড়িয়া দেখিবেন।

বস্তুতঃ এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ আমার মানসপটে পর পর ছবির উপর ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনের পূর্ব্ব সীমান্তে আরালিয়া গ্রামে আমাদের অন্যতম কাব্যনায়ক চাঁদ বিনোদের শ্বশুরবাড়ী, এই খানে মলুয়ার পদ্মের পাপড়ির মত দুটি চোখের সঙ্গে বিনোদের ভ্রমরকৃষ্ণ দৃষ্টির প্রথম শুভমিলন হয়—অপরাহ্ণ কাল, সূত্যা নদীর তীরস্থ বক্শাইয়া গ্রামে সম্ভবতঃ চাঁদ বিনোদের বাড়ী ছিল, তথা হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশষ্পময়ী বনভূমির উপান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া "ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা" মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত বৃন্দাবন ও জলের নীলাভ শোভা দেখিতে দেখিতে বাপীস্পর্শ শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাঁদ বিনোদ ঘাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মত নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল তাহার পায়ে লুটাইতেছিল ও তাহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জন মনে করিয়া কুড়া পাখী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কুড়ার ডাক আসন্ন বর্ষার আবেশ আনয়ন করিয়াছিল। এই আরালিয়া গ্রামের ১৩।১৪ মাইল উত্তরে ধলাই বিল, "বিস্তার ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা"[১]; এই বিলের ৭।৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত জাহাঙ্গীরপুর হইতে জাহাঙ্গীর দেওয়ান ধনু নদীর একটা উপশাখা বাহিয়া একদা দ্বিপ্রহর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার করিতে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে মলুয়া। সহসা ঝুপঝাপ্ শব্দে তরুণী নর্ত্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে কয়েকখানি পানসি আসিয়া দেওয়ান সাহেবের তরীখানি ঘিরিয়া লইল। মলুয়ার ভ্রাতৃগণের সেই সকল পানসি নৌকা; পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলে বিহঙ্গী যেমন স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া যায়—মলুয়া তেমনই অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল—তখন "আট দাড়ী নৌকা" পদ্মবন ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে আরালিয়ার অভিমুখে রওনা হইল।[২] এগুলি সত্যঘটনা, অথচ অপূর্ব কবিত্বময়। সেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল জাহাঙ্গীরপুর ও সূত্যা নদী এখনও আছে এবং তথাকার চাষারা তাহাদের আদর্শ রমণী মলুয়ার কথা এই দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই—তাহারা এখনও নানা বাদ্যযন্ত্রসহকারে সাশ্রু নেত্রে সেই গীতি গাহিয়া থাকে।

গিরিনদীর ন্যায় দুর্জ্জয়শক্তিশালিনী, প্রেমের সীমাহীন আকাশের নৃত্যশীলা ময়ূরী মহুয়া জৈন্তা পাহাড় হইতে ছুটিয়া বামুনকান্দা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রাম নেত্রকোণা সাব-ডিভিসনে 'তলার হাওরের' নিকট। বামুনকান্দা, উলুয়াকান্দা, বেদের দীঘি,

[১] মলুয়া, ৯০ পৃষ্ঠা। [২] মলুয়া, ৯১ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর বাড়ীর ভিটা এখন উচচ ভূখণ্ডে পরিণত ; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জন-মানবশূন্য। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্মৃতিতে এখনও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ভরপুর। জৈন্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পুষ্পারণ্য, যেখানে মহুয়া ও নদের চাঁদ কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর-এক তীর্থ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে দ্বিজবংশীদাস ও তাঁহার গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতী একত্রে "মনসার ভাসান" রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্বিনী, সহসা চন্দ্রিকাভূষিত শারদাকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশান্ত পূজারিণীর শুদ্ধ চিত্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের একটা আকস্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসগ করিয়া চন্দ্রাবতী যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহার গাত্রে রক্ত মালতীফুলের রস দিয়া উন্মত্তবৎ জয়চন্দ্র তাঁহার শেষ নিবেদন অনলবর্ষী অনুতাপের ভাষায় লিখিয়া ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন,—সেই জরাজীর্ণ মন্দিরের অবশেষ নাকি ফুলেশ্বরীর তীরে এখনও বিদ্যমান। এই পাতুয়ারী গ্রামের পার্শ্বেই 'জালিয়ার হাওর', এইখানে বংশীদাস দস্যু কেনারাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং নলখাগড়ার বনাকীর্ণ এই হাওরেই বংশীদাসের কণ্ঠের অপূর্ব্ব মনসাসঙ্গীতে প্রস্তরকঠিন দস্যুর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভে অনুতপ্ত দস্যু তাহার বহুবৎসর-সঞ্চিত রত্নমাণিক্যপূর্ণ ঘড়াগুলি বিসর্জন দিয়া স্বীয় কোষনির্ম্মুক্ত অসিদ্বারা আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল।

কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী বিপ্রগ্রাম (বিপ্রবগ) কবি কঙ্কের নিবাসভূমি, নেত্রকোণার দক্ষিণে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী রাজী (রাজেশ্বরী) নদীর তীরে কঙ্ক বাঁশী বাজাইয়া গরু চরাইতেন এবং যখন অপরাহ্নে বিশীর্ণ পদ্মপ্রভ শ্রমকাতর মুখে গগাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, তখন ফুল্ল নেত্রে দেখিতে পাইতেন, কুটীরবাসিনী লীলা উৎকণ্ঠায় তালপত্রের ব্যজনীহস্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা জ্বালাইয়া অপর হস্তে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গর্গ সহসা প্রত্যাগত কঙ্ককে দেখিয়া দাবদগ্ধ তরুর ন্যায় শোকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং "মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেষ কথা" এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোণায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ "বাঘরার হাওর" সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্য্য রূপে সংশ্লিষ্ট। সোনাই-এর মত কত রূপসী সাধ্বীর সর্ব্বনাশ করিয়া 'বাঘরা' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাজ সর্ত্তে দান পাইয়াছিল, তাহারই নামে কলঙ্কিত হইয়া এই বিল এখনও পরিচিত। দীঘলহাটি গ্রামটির এখন অস্তিত্ব নাই, এই গ্রামের সন্নিহিত নদীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকেরা রোরুদ্যমানা

সোনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হালিয়ারা (হলিয়া) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাত মাইল উত্তরে রঘুপুরে দয়াল নামক কোন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই কথা লিখিবার পরে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে "হালিয়াঘাট" নামক স্থানকেই 'হলিয়া' বলিয়া মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ জঙ্গলে নাকি এখনও বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন কেশর রায়, লৌকিক উচ্চারণে 'কাছার রায়'। এই কেশর রায় দয়াল রাজার কেউ কি-না জানা যায় নাই, হয়ত এই রাজপ্রাসাদেই নিদান কারকুনের বিচার হইয়াছিল, এবং কমলা মহিলাজনোচিত লজ্জাশীলতা এবং নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী যেরূপ সরল কথায় বলিয়াছিলেন, তাহা করুণ কবিত্বে উপপ্লুত, নির্ভীকতায় ভরপুর এবং সংযম-সহিষ্ণুতার সারস্বরূপ। হালুয়াঘাট মৈমনসিংহ হইতে ত্রিশ মাইল উত্তরে।

সুতরাং পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি, কুড়াপাখীর গুরুগম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর' ও সানবাঁধা পুকুরঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালী-ধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ, নটারডেম, রোমের ভাটিকান প্রভৃতি দেখিতে আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদাঙ্কলাঞ্ছিত আরালিয়া গ্রাম ও বংশদণ্ডের উর্দ্ধে রজ্জুর উপর নর্ত্তনশীলা মহুয়া নর্ত্তকীর অপূর্ব্ব নর্ত্তনের স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা প্রভৃতি পল্লী দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই সকল স্থানে বাঙ্গালীর ঘরের শোভা শত শতদলের মত ফুটিয়া জগৎকে যে সুষমা দেখাইয়াছিল, আমাদের পোড়া দেশের সেই অমর আলেখ্য এতকাল আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি। এণ্ড্রোমেকি, মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমনা ও নোরা আমাদের হৃদয়ে যে সুর জাগাইতে পারিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুয়া জাগাইবে, ইহাতে আমার সংশয় নাই। আমাদের ললনাকুল ফুলদলকোমল হইয়াও প্রেমের তপস্যায় কিরূপ বজ্রকঠোর, তাহা এই সকল গাথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। মৈমনসিংহের পাড়াগাঁগুলি এই গীতিকাসমূহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্থমর্য্যাদার দাবী করিতেছে।

ময়মনসিংহে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের কেহ কি এই সকল অমর-অমরীর লীলাভূমি—এই পল্লীগুলিতে কোন স্মৃতিচিহ্নের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের দেশের প্রতি জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণের ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না? হায়রে! আমাদের দেশের সমস্ত ধনরত্ন সমুদ্রপথে শত শত যানারোহণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আছে তাহাও বিলাস ও পর-মনোরঞ্জনের শতচেষ্টায় সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়াই আছে।

আমাদের দেশে এখন কোন কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা দূরপরাহত স্বপ্ন। বিলাতে এইরূপ উপলক্ষে প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্য শত জনশূন্য স্থান বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ে পরিণত হইতেছে। স্কটের কবিতায় লক্‌লেমন, লক্‌কেট্রিন এবং পার্থশায়ার প্রভৃতি স্থান শত কীর্ত্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রীর কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তো সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে চাই, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমের কণিকা যদি আমরা লাভ করিতাম, তবে এই বিরাট কর্ম্মশালায় কর্ম্মী হইয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতাম, কেবল বক্তৃতা ও অসার বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে থাকিতাম না। আর এই সকল গীতিকার কথা কি বলিব? এ যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। বঙ্গভারতী বৈষ্ণব গীতিকার রক্ত শতদলে বসিয়াছিলেন,—এবার তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের শুভ্র কুমুদদলাসীনা দেখিলাম।

৮। পালাগুলির বিবরণ

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে গত তিন-চার বৎসর যাবৎ অক্লান্ত উদ্যমে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এই পালাগুলির উদ্ধার করিয়াছেন; তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, আমার চক্ষুদুইটি তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, আমি প্রতিপদে তাঁহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সম্বলিত পত্র লিখিয়া সহায়তা করিয়াছি,—কি ভাবে কোন্ পালা সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ পালার ঐতিহাসিক মূল্য কি,—কোন্ গুলির উদ্ধার আপাততঃ ক্ষান্ত রাখিয়া কোন্ দিকে বেশী চেষ্টা করিতে হইবে, কোথায় কোন্ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে জানাইয়াছি, এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে সম্যক্ রূপে উপদেশ দেওয়ার জন্য গত বৎসর তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিন আমাদের এখানে থাকিয়া এই সংগ্রহকার্য্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবহিত হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহাকে ক্রমাগত লিখিয়া লিখিয়া আমি গীতোক্ত গ্রামগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছি। সার্ভে ডেনারেলের আফিসের ম্যাপে 'হাওর' ও নদীগুলির অনেকেরই নাম নাই; যে সকল গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ জনশূন্য ভিটাগুলির নামে মাত্র স্থানীয় পরিচয় আছে, তাহা উক্ত আফিসের মানচিত্রে নাই। আমি পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম-সম্বলিত মানচিত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চন্দ্রকুমারের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক যে মানচিত্র-খানি অঙ্কিত করিয়াছি তাহা প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বারা গীতোক্ত স্থানগুলি নখদর্পণের ন্যায় পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। চন্দ্রকুমার দে-প্রেরিত মহুয়ার পালায় কতক-গুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন

তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। এই তিন-চার বৎসর যাবৎ আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা রচনা ছাড়া সংগ্রহসম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সর্গে বিভক্ত করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেরূপ বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, সুতরাং ঐভাবে বিভাগ না করিলে গাথাগুলির পয়ার নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া যায়।

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা পড়িয়া সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভূমিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম, কিন্তু ইংরাজী ভূমিকায় যাহা নাই, এমন অনেক কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। এই দুই ভূমিকা পড়িয়া পাঠক এই গাথাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র, ইংরাজী সাধারণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুক্রমণিকা, ইংরাজী অনুবাদ ও ১১খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। এই (দ্বিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত মূল দেওয়া হইল। প্রথমখণ্ডে এই দুই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাথা দিলাম, যথা :—

১। মহুয়া	২। মলুয়া
৩। চন্দ্রাবতী	৪। কমলা
৫। দেওয়ান ভাবনা	৬। দস্যু কেনারাম
৭। রূপবতী	৮। কঙ্ক ও লীলা
৯। কাজলরেখা	১০। দেওয়ানা মদিনা

১। মহুয়া—নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গান রচনা করেন। প্রবাদ এই, দ্বিজ কানাই নমশূদ্র-সমাজের অতিহীনকুল-জাতা এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই 'নদের চাঁদ' ও 'মহুয়া'র কাহিনীতে তিনি এরূপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। নদের চাঁদ ও মহুয়ার গান একসময়ে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কঠোর শাসনে এই গীতিবর্ণিত প্রেম দুর্নীতি বলিয়া প্রচারিত হয়, এবং হিন্দুরা এই গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গাতি-বর্ণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট—রহমৎপুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে "তলার হাওর" নামক বিস্তৃত 'হাওর'—ইহারই পূর্ব্বে বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুরবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি, প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশূন্য হইয়া রাজকুমার

ও মহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এই প্রণয়িযুগ্মের বিষয় লইয়া নানা কিংবদন্তী এখনও লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। যে কাঞ্চনপুর হইতে "হোমরা" বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—তাহা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোনা পোষ্টাফিসের অধীন মস্‌কা ও গৌরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে—মস্‌কা গ্রামের সেক আসক আলী ও উমেশচন্দ্র দে এবং গৌরালীর নসুসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত হয়। মস্‌কা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি দল আছে। এক সময়ে যে গাথা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শত শত পল্লীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা একটা ভগ্নদণ্ডে পর্য্যবসিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ আমি চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে এই গাথা পাইয়াছি। চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায় এই ভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।

এই গানের মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন।

২। **মলুয়া**—গ্রন্থকারের নাম নাই। গোড়ায় চন্দ্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা। আমার নিকট এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইশা খাঁ সবে মাত্র পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তখনও "নজর তরপের ছেলেরা" আবির্ভূত হইয়া পরস্ত্রীহারক দস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও ১০০ বৎসর পরে এই ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। জাহাঙ্গীর দেওয়ান কোন্ বংশসম্ভূত তাহা জানিবারও উপায় নাই। গীতি-বর্ণিত আরালিয়া গ্রাম ভাদৈর নদীর তীরবর্ত্তী এবং কিশোরগঞ্জ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে; ইহারই ৪।৫ মাইল দূরে "সূত্যা" নদীর কূলে চাঁদ বিনোদের বাড়ী ছিল, সূত্যা নদী আরালিয়া হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই গ্রামটির নাম নাই। ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) "বংশাইয়া সতী কন্যা হইল অবতার" পদটির "বংশাইয়া" শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে পারে, "বংশাইয়া" শব্দের ভিন্নার্থ (অর্থাৎ "সেই বংশে") হওয়াও অসম্ভব নয়। বংশাইয়া নামক কোন গ্রাম আরালিয়ার নিকটে নাই, কিন্তু উক্ত গ্রামের ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে "বক্‌শাইয়া" নামক এক গ্রাম আছে। লিপিকারগণ অজানিত দেশের নাম লইয়া প্রায় লিখিতে ভুল করিয়া থাকেন, সুতরাং 'বক্‌শাইয়া'র 'বংশাইয়া'-রূপ-গ্রহণ আশ্চর্য্য নহে। গীতোক্ত

"ধলাই বিল" আরালিয়া গ্রামের ৩০ মাইল উত্তরে। জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয়া হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সম্ভবতঃ ধনু নদীর শাখাপ্রশাখা বাহিয়া দেওয়ান জাহাঙ্গীর মলুয়ার সঙ্গে কুড়া শীকার করিতে "পদ্মোৎপলঝষাকুল" ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন।

'মলুয়া' পালাটি চন্দ্রবাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকণ্ঠস্থিত 'পদমশ্রী' গ্রামের পাষাণী বেওয়া, রাজীবপুরের সেখ কাঞ্চা, মঙ্গলসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধুপী, সাউদ পাড়ার জামালদিসেক, দুলাইল-নিবাসী মধুর রাজ এবং পদমশ্রীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গাথার মোট ছত্রসংখ্যা ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর এই গীতিকা আমার হস্তগত হয়।

৩। **চন্দ্রাবতী**—নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। এই কবি রঘুসুত, দামোদর প্রভৃতি অপর অপর কয়েকজন কবির সহযোগে 'রুক্ক ও লীলা' নামক আর-একটি গাথা প্রণয়ন করেন। চন্দ্রাবতী সুবিখ্যাত মনসাভাসান-লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা। পিতা ও কন্যা একত্র হইয়া মনসাদেবীর ভাসান ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী বাঙ্গালা ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে মহিলা-সমাজে এখনও ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তাহার একখানি আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে। জয়চন্দ্রকে ভালবাসিয়া এই সাধ্বী ব্রাহ্মণললনা যে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই ঘোর পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনার ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এই গাথাটিতে বর্ণিত আছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই চন্দ্রাবতীর পরিচয় ভাল করিয়া জানেন। বংশীদাসের পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা। চন্দ্রাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী-নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ধরণী।
বাঁশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়॥
দ্বিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছলার পানি॥

ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল-কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়ীতে দরিদ্র-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তাঁর ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসা-পদ পূজি ভক্তিভরে।
চাল-কড়ি কিছু পান মনসার বরে॥
দূরিতে দারিদ্র্যদুঃখ দেবীর আদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে দিলা উপদেশ॥
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যাঁর কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি জুড়ি দুই কর।
যাঁহার প্রসাদে হৈল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব-শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী-নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥"

দেখা যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে এবং চন্দ্রার আজীবন কুমারীব্রত-গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। কারণ এই গাথায়ই আছে, মনে শান্তিস্থাপনের জন্য বংশী চন্দ্রাকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমঘটিত কথার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়া গিয়াছিল "চন্দ্রা অভাগিনী" কথাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। তিনি যে পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া তাঁহাদের চিরকষ্টদায়ক হইয়া থাকিতেন—ঐ পদের পূর্ব্ব-ছত্রে সে কথাও রহিয়াছে। এই গাথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্দ্রার করুণ আত্মবিবরণীটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশ্বরী নদীর তীরস্থ পাতুয়ারী গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং যে মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুষ্পের রস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফুলেশ্বরীর তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশ্যকে ভগবদ্‌ভক্তিতে উজ্জ্বল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। জয়চন্দ্রের বাড়ী ছিল সুন্ধ্যা গ্রামে, তাহা পাতুয়ারীর অদূরবর্ত্তী ছিল। নয়ানচাঁদ ঘোষ কোন্ সময়ে এই গাথাটি রচনা

করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে রঘুসুত কবি যিনি ইঁহার সঙ্গে "কঙ্ক ও লীলা" লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। রঘুসুতের বংশ-লতায় এই অনুমান সমর্থিত হয়। পাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশী দূরে নহে। এই গাথাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪। ইহাকে আমরা ১২ অঙ্কে বিভাগ করিয়া লইয়াছি।

৪। কমলা—ভণিতায় কবির নাম দ্বিজ ঈশান পাওয়া যাইতেছে। 'হলিয়া' নামক কোন গ্রাম পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে পাইলাম না। তবে "হালিয়ারা" গ্রামটি নন্দাই হইতে বেশী দূরে নহে। এই হালিয়ারার নিকটে রঘুপুর আছে। এই হালিয়ারা 'হলিয়া' হইতে পারে, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত হালিয়াঘাট নামক স্থানই খুব সম্ভব কাব্যবর্ণিত হলিয়া। কারণ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ জঙ্গলে বিস্তৃত রাজবাড়ী ও গড়খাই প্রভৃতির চিহ্ন আছে, ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে তথায় কেশররায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিধবারমণী শত্রু কর্ত্তৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগ্ন দীঘির জলে প্রাণত্যাগ করেন। এই কেশররায় "দয়াল রাজা"র বংশধর হইতে পারেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম-বাসিনী তিন-চারটি রমণীর নিকট হইতে চন্দ্রকুমার এই গাথাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা ১৩২৮ সনের ১৯শে আষাঢ় আমার হস্তগত হয়। আমি গাথাটিকে ১৭ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি, ছত্রসংখ্যা মোট ১৩২০।

৫। দেওয়ান ভাবনা—দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকায় বর্ণিত আছে, তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা অকারণ নহে।

দেওয়ান ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছত্রে সম্পূর্ণ,—আমি গানটিকে ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি। এই গীতিকা ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গীতি-বর্ণিত "বাঘরা"র নামে তদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটি হাওর পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর মত বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাঘরা নামক এক গুপ্তচর ('সিন্ধুকী') দেওয়ান-দের নিকট হইতে এই বিস্তৃত 'হাওর' লাখেরাজস্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিল। 'বাঘরার হাওর' নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বোধ হয় 'দীঘলহাটী' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত হাওরের নিকটবর্ত্তী 'ধলাই' নদীর তীরে 'দেওয়ানপাড়া' নামক একটি গ্রাম আছে, —সম্ভবতঃ এইখানেই 'দেওয়ান ভাবনা'র আবাস ছিল।

'দেওয়ান ভাবনা' ১৯২২ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকুমার দে আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান তিনি শুনিয়াছিলেন। নৌকা-'বাছ' দেওয়ার সময়ে এখনও তাহারা এই গান গাহিয়া থাকে।

৬। দস্যু কেনারাম—চন্দ্রাবতী প্রণীত। চন্দ্রাবতীর পরিচয় তৎসম্বন্ধীয় গাথার বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেনারামের বাড়ী ছিল বাকুলিয়া গ্রামে। নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ সুপ্রসিদ্ধ "জালিয়ার হাওর" কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্ত ঘটনা ১৫৭৫ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমাহতা চন্দ্রা জয়চন্দ্রের শব দর্শন করার অল্পকাল পরেই হৃদ্‌রোগে লীলা সংবরণ করেন। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য ধনরত্ন বিসর্জন দিয়াছিল। এই গীতের মোট ছত্র-সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেবীর গান, সেগুলি অপরাপর কবির লেখা, সুতরাং আমি গাথাটির অনেকাংশ বর্জন করিয়াছি। মনসাদেবীর গানের মধ্যে যেখানে চন্দ্রাবতীর লেখা কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষত্রচিহ্নিত করিয়াছি।

৭। রূপবতী—এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। ছত্রসংখ্যা ৪৯৩। ১৯২২ খৃঃ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ ইহা আমার হস্তগত হয়। আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। এই গাথার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য ইংরেজী ভূমিকায় দিয়াছি।

৮। কঙ্ক ও লীলা—এই গাথার রচক ৪ জন, দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া। রঘুসুত ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে পাটুনি, বহু পুরুষ যাবৎ ইহারা গায়কের ব্যবসা করিতেছে, ইহারা এজন্য 'গায়েন' (ময়মনসিংহে 'গাইন') উপাধিতে পরিচিত। রঘুসুতের নিম্নতম বংশধর, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 'কঙ্ক ও লীলা'র পালা অতি উৎকৃষ্টভাবে গাইতে পারিত। ইহাদের বাড়ী নেত্রকোণায় কেন্দুয়া থানার অধীন "আওয়াজিয়া" গ্রাম। উৎকৃষ্ট পালাগায়ক বলিয়া ইহারা গৌরীপুরের জমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর জমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছে। ২০।২১ বৎসর হইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে। কবিকঙ্ক পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র; ইনি বিপ্রবর্গ বা বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রাম কেন্দুয়ার অদূরবর্ত্তী রাজেশ্বরী বা রাজী নদীর তীরে. বিপ্রবর্গের নিকট ধলেশ্বরী বিলের সন্নিকট এখনও পাঁচ-পারের একটা জায়গা আছে এবং তথায় "পারের পাথর" নামক একটা পাথর আছে। গীতোক্ত পীর এইখানে আড্ডা করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কের রচিত "মলুয়ার বারমাসী" এক সময়ে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঝাব্যরঙ্গের খনি ছিল। এখনও তাহার দুই-একটি গান গ্রাম্যকৃষকের মুখে শোনা যায়। এখন পর্য্যন্ত আমরা পালাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু চন্দ্রকুমারের বহু চেষ্টায় কবিকঙ্কের "বিদ্যাসুন্দর"-খানি সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্যাসুন্দরের মুখবন্ধে কবি তাঁহার পিতামাতার

নাম, তাঁহার চণ্ডাল পিতা ও চণ্ডালিনী মাতার নাম ও গর্গের কথা লিখিয়াছেন। কবিচতুষ্টয়-প্রণীত এই গাথায় তাঁহার বাল্যলীলার যে ইতিহাস আছে তিনি নিজেও সেই কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পল্লীগাথাগুলির ঐতিহাসিকত্বের ইহা অন্যতম প্রমাণ। খুব সম্ভব কঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

"কঙ্ক ও লীলা" ১০১৪ সংখ্যক ছত্রে পূর্ণ। আমি এই গাথাটিকে ২৩ অঙ্কে বিভাগ করিয়া লইয়াছি। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালা 'বিদ্যাসুন্দর'গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাণারাম কবি 'বিদ্যাসুন্দর'গুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নিমতাবাসী কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরকে 'আদি বিদ্যাসুন্দর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবিদের কথা অবগত ছিলেন না।

৯। কাজলরেখা—এটি একটি রূপকথা। এই গীতিগুলি-সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় ভূতপূর্ব্ব লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, ভারতীয় কলাশাস্ত্রবিশারদ ষ্টেলা ক্র্যামরিচ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে সকল উচচপ্রশংসাযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এবং অপরাপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রথম খণ্ডে ইংরেজী ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লাট রোনাল্ডসে এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১০। দেওয়ান মদিনা—বালিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের সম্বন্ধে গাথা। এই গানে ধনু নদীর উল্লেখ আছে, দীঘলহাটি গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার লেখক মনসুর বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা যেমন তাঁহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরসসৃষ্টিতে সুপটু ছিলেন, তাহাও তেমনই অবধারণ করা যায়। মদিনার স্বামীর ভালবাসায় অগাধ বিশ্বাস—যাহা তালাকনামা পাইয়াও দীর্ঘকাল টলে নাই—সে অগাধ বিশ্বাসে যেদিন হানা পড়িল, সেদিন সে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইল। তাহার অপূর্ব্ব সংযম, যাহাতে এরূপ কৃতঘ্নতায়ও স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথা সে বলিতে পারিল না, এই অপূর্ব্ব প্রেম ও চিত্তসংযম কোন্ উচচ লোকের, পাঠক তাহা ধারণা করুন। চাষার ভাষায় চাষার লেখা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও নিবেদন

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐকান্তিক দুরবস্থার সময়ে যিনি শত অন্তরায় সত্ত্বেও সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত অটল পণে এই বিদ্যাপীঠকে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাসনটিকে সর্ব্বপ্রকার অপঘাত হইতে রক্ষা

করিয়াছেন, সেই বিদ্যালোকোদ্ভাসিত, অজেয় শক্তিশালী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগৃহীত অথবা প্রকাশিত হইত না।

যখন আমরা খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিতেছিলাম, সেই খাটুনির যে সামান্য বেতন তাহাও কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে মঞ্জুর করেন নাই, যখন আমাদের কোন অধ্যাপক গৃহের পালিত দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয় করিয়া, কেহ বা স্ত্রীপুত্রকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত কোন দূর পল্লীতে পাঠাইয়াও স্বীয় দগ্ধোদর পালন করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে, যখন শত শত দুঃস্থ অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া রোষে ক্ষোভে আশুতোষ বহু চেষ্টায় অশ্রু সংরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন—সেই দুঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাঁহাকে অতি কুণ্ঠার সহিত ভয়ে ভয়ে জানাইয়াছিলাম। কোথা হইতে টাকা আসিবে, দুর্য্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তো আমরা তাহা জানিতাম না। সেই সময়েও তাঁহার সেই চিরশ্রুত অভয় বাণী শুনিয়াছিলাম: "ভয় কি দীনেশবাবু, ছাপিতে দিন্ আমি চালাইব।" এইজন্যই তো ইঁহাকে আমরা কাণ্ডারী করিয়াছি, আর কে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কাণ্ডারী হইবেন? এরূপ একনিষ্ঠ, অটল, বীরব্রত ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব? বৈষ্ণব কবিতার ভাষায় সরকার বাহাদুরকে জোর গলায় শুনাইয়া বলা যায়—"বিনা কড়িতে এমন নফর কোথা পাবি?"

মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ধর, বি.এ. মহাশয় মৈমনসিংহে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের অর্থ লিখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, এম.এ. মহাশয় নিজে মৈমনসিংহনিবাসী, তিনি এই পুস্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়াছেন এবং দেশের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানচিত্রখানির জন্য একশত টাকা দিয়াছেন। ছবি, ব্লক প্রভৃতির জন্য বাণীসেবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন, আমি নিজে এই গীতিকাগুলির উপলক্ষে দুইশত টাকার উপর ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট কি আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই? আরও শত শত পালাগান সংগ্রহ করা বাকী। সমস্ত বঙ্গদেশে এই মহামূল্য উপাদান ছড়াইয়া আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এই পালাগানগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনি এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পূর্ব্ববঙ্গ নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন।" আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি, "আপনি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলিয়া দিন, আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব।" রাজপুত পালাগান (baliad)-গুলির যতটা

একলক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, আমি পঁচিশ হাজার টাকায় তদপেক্ষা বেশী কাজ দেখাইতে পারি।

মৈমনসিংহবাসিগণ কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করিয়া এই গাথাগুলি-সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা জানাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ও আপাততঃ কাজ চালাইবার মতন দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিলাম। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। আমি সভা হইতে আশ্বাস পাইয়াছিলাম যে, শীঘ্রই এই টাকা সংগৃহীত হইবে। কিন্তু ঝুলি কাঁধে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে বাহির না হইলে ভিক্ষা জোটে না। আমি রোগের দরুন বিছানায় পড়িয়া আছি, আমি ভিক্ষুক সাজিয়া বড় মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া হাত পাতিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আমি মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লজ্জা বোধ করি, সেখানে কি আমার কোন দাবীই নাই?

আমি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াছি। ইংরাজী খণ্ডের ভূমিকা পাঠ করিলে আপনারা তাহা জানিতে পারিবেন, আমি নিজ হইতেও যথাসাধ্য খরচ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই—কিন্তু তজ্‌জন্য আমি কোন পুরস্কারের দাবী করিতেছি না। কর্ম্মে সফলতাই আমার পুরস্কার, এই পালাগানগুলি দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে। প্রুফ দেখাইতে যে সকল সাহেবের নিকট গিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পড়িতে ঘন ঘন রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়াছেন। সেই চোখের জলের মত পুরস্কার আমি আর কোথায় পাইব? যেদিন ষ্টেলা ক্র্যামরিচ মহুয়া গল্পটি পড়িয়া আমাকে লিখিলেন, "সারাদিন জ্বরের ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মত দেখিয়াছি। আমি ভারতীয় সাহিত্য যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মর্ম্মস্পর্শী, এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই," সেই দিন আমি আমার প্রাণান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছি। আর যখন আমি মহামনা লর্ড রোনাল্ডসকে লিখিয়াছিলাম, "আপনি দুটি মাত্র ছত্র লিখিয়া দিন, আমার পুস্তকখানি সেই রাজসম্মান মলাটের পুরোভাগে লইয়া প্রকাশিত হইবে।" তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "এই পালাগানগুলি এত চমৎকার যে, দুটি ছত্র লিখিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি না।" একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিলেন; সেই দিন কি আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাই নাই? সর্ব্বশেষ যখন পুস্তকখানি হাতে লইয়া আশুতোষ তাঁহার সমস্ত প্রাণভরা সন্তোষের হাসিতে স্বীয় গুম্ফ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়া আমার দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন,—পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে "পুন্নমাসী চাঁদ যেমন দেখায় নদীর তলা" সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে নিঃশেষভাবে ধরা পড়িয়া গেল,—তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্ স্বর্ণপদক তাহা আমাকে দিতে পারিত?

সুতরাং আমার কথা যাউক,—দীনহীন চির-অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য চন্দ্রকুমারকে কোন উৎসাহ দেওয়া কি মৈমনসিংহবাসীর কর্ত্তব্য নহে? এই যে তাঁহাদের দেশের পল্লীগাথা সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উচচ স্থানের দাবী করিতেছে, সেই গাথাভাণ্ডারের উদ্ধারকল্পে কি তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহার জন্য কি কোন ব্যবস্থাই হইবে না?

গাথাসাহিত্যের ভাষা পাড়াগেয়ে, ছন্দ শিশুর আধ আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা,—পূর্ণতা পায় নাই। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাষায় আজ যাহা সুন্দর ও মার্জিত, পরবর্ত্তী কালে তাহা 'সেকেলে' ও অমার্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা এক সময়ে আদর্শ ভাষা ছিল, সেকেলে লোকেরা শতমুখে তাহা প্রশংসা করিতেন, এখন সে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা কি আর কেহ প্রশংসা করেন? এমন কি বঙ্কিমবাবুর ভাষাগৌরব পর্য্যন্ত কতকটা অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভাষার ঐশ্বর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদর্শ-সংস্থাপনে—কবিত্বে ও কারুণ্যে, মর্ম্মকথার অভিব্যক্তিতে ও চরিত্রমর্য্যাদা-রক্ষণে—ঐতিহাসিকতায় ও কল্পনার শোভায়, এই গাথাগুলি বঙ্গসাহিত্যকে এক নব জয়শ্রী পরাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গাথাসাহিত্য উদ্ধারকল্পে যিনি কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি নিম্নের ঠিকানায় আমাকে স্মরণ করিবেন। আমি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাকে জানাইব।

২৪শে নবেম্বর, ১৯২৩
৭, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার —কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মহুয়া

(দৃশ্যকাব্য)

দ্বিজ কানাই প্রণীত

মৈমনসিংহ-গীতিকা

মহুয়া।

(প্রাচীন পল্লীনাটিকা)

—:*:—

বন্দনাগীতি

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর[১]।
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর[২]॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজ্‌জি করে চান্দ সদাগর॥
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্‌বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের[৩] পাথ্‌থর॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন[৪] স্থান।
উর্‌দিশে[৫] বাড়ায়[৬] ছেলাম মমিন[৭] মুসলমান॥
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু[৮] মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥
চাইর কুনা[৯] পির্‌থিমি[১০] গো বইন্দ্যা[১১] মন করলাম স্থির।
সুন্দর বন[১২] মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর॥

[১] ভানুশ্বর = ভানুর ঈশ্বর = (শিব?)
[২] পশর = প্রসার (?), প্রকাশ, আলোক।
[৩] মালামের = পদচিহ্নের।
[৪] এন = হেন।
[৫] উর্‌দিশে = উদ্দেশে।
[৬] বাড়ায় = হাত বাড়াইয়া (সেলাম করা)।
[৭] মমিন = বিশ্বাস্।
[৮] ইন্দু = হিন্দু।
[৯] কুনা = কোণা। ময়মনসিংহ প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে "ও" কারের স্থানে "উ"কার-ব্যবহারের রীতি আছে, যথা চোর = চুর।
[১০] পির্‌থিমি = পৃথিবী।
[১১] বইন্দ্যা = বন্দনা করিয়া।
[১২] সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের দেব দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজির যুদ্ধের কথা অনেক পুস্তকেই আছে। কৃষ্ণরামের দক্ষিণরায়ের পালাতে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ আছে। পুথির নাম "রায়-মঙ্গল"।

আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দে আর সূরুয[১]।
আলায-কালায বন্দুম কিতাব আর কুরাণ[২]॥
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিন্নতি[৩]॥ ১—১৬

বন্দনাগীতি সমাপ্ত।[৪]

(১)

হুমরা বেদে

উত্তর‍্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্‌বত॥
হিমানী পর্‌বত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর[৫]॥
চান্দ সূরুয নাই[৬] আন্দারিতে[৭] ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে[৮] মাইন্‌সের[৯] নাই লরাচরা[১০]॥
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা[১১] নাম।
তাহার কথা শুন কইরে ইন্দু[১২] মুসলমান॥
ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দ্দার।
মাইন্‌কা নামে ছুড়ু[১৩] ভাই আছিল তাহার॥

১ সূরুয = সূর্য্য।
২ আলায-কালায = ঈশ্বরের কথা। কুরাণ = কোরাণ।
৩ মিন্‌তি = মিনতি।
৪ এই বন্দনাগীতিটি প্রায়ই জনৈক মুসলমান গায়েনের রচিত।
৫ সমুদ্দর = সমুদ্র।
৬ চাঁন্দ সূরুয নাই = চন্দ্র ও সূর্য্য নাই।
৭ আন্দারিতে = আন্ধারে।
৮ বইসে = বাস করে।
৯ মাইন্‌সের = মনুষ্যের।
১০ লরাচরা = নড়াচড়া।
১১ বাইদ্যা = বেদে।
১২ ইন্দু = হিন্দু।
১৩ ছুড়ু = ছোট।

ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা ভ্রমে নানান দেশ।
অচরিত[১] কাইনী কথা কইবাম সবিশেষ॥
আর ভাইরে,
ভর্‌মিতে[২] ভর্‌মিতে তারা কি কাম করিল।
ধনু নদীর পারে যাইয়া উপস্থিত অইল॥
কাঞ্চনপুর নামে তথা আচিল[৩] গেরাম।
তথায় বসতি করত বির্দ্ধ[৪] এক বরাম্মন[৫]॥
ছয় মাসের শিশু কইন্যা[৬] পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী॥
চুরী না কইর‍্যা হুমরা ছার‍্যা[৭] গেল দেশ।
কইবাম্ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ॥
ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের[৮] হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পক্ষী[৯] পালিতে লাগিল॥
এক দুই তিন করি গুল[১০] বছর যায়।
খেলা কছরত[১১] তারে যতনে শিখায়॥
সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা[১২] জলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জলে কাঞ্চা সোনা॥
হাট্টায়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা[১৩] উঠে কনক চাম্পার ফুল॥

[১] অচরিত = অপূর্ব্ব।
[২] ভর্‌মিতে = ভ্রমণ করিতে।
[৩] আচিল = আছিল, ছিল।
[৪] বির্দ্ধ = বৃদ্ধ।
[৫] বরাম্মন = ব্রাহ্মণ।
[৬] কইন্যা = কন্যা।
[৭] ছার‍্যা = ছাড়িয়া।
[৮] বচ্ছরের = বৎসরের (এক বৎসরের)।
[৯] পক্ষী = পক্ষী (এই শব্দ এখনও 'ময়ূর-পক্ষী' কথায় ব্যবহৃত হয়)।
[১০] গুল = ষোল।
[১১] কছরত = কৌশল।
[১২] থাইক্যা = থাকিয়া।
[১৩] ফুট্টা = ফুটিয়া।

আগল ডাগল[১] আখিরে আস্‌মানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা[২]॥
বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন।
এই কইন্যা লইয়া বাইদ্যা ভর্‌মে তির্‌ভুবন॥
পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইদ্যার নারী।
ভাব্যা চিন্ত্যা নাম রাখল "মহুয়া সুন্দরী"॥ ১—৩৭

(২)

গারো পাহাড়; বনপ্রদেশ

(হুমড়া ও মাইন্‌কিয়া সহ দলবলের প্রবেশ)

হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতে[৩] যাই॥
মাইন্‌কিয়া বাইদ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন।
বৈদেশেতে যাব আমরা শুক্কর বাইর‍্যা[৪] দিন॥
শুক্কুর বাইর‍্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া।
দলের লোক চলে যত গাট্টীবুচ্‌কা[৫] লইয়া॥
আগে চলে হুমরা বাইদ্যা পাছে মাইন্‌কিয়া ভাই।
তার পাছে চলে লোক লেখা জুখা নাই॥
বাশ তাম্বু লইল সবে দড়ি আর কাছি।[৬]

[১] আগল ডাগল = সুদীর্ঘ। কোন কোন স্থলে 'আগল দীঘল' কথা পাওয়া যায়।
[২] পাশুরা = পাশরা = বিস্মরণ হওয়া। "পাশরিতে করি মনে গো না যায় পাশরা"—চণ্ডীদাস।
[৩] এরূপ ঐকার অনেক শব্দেই পাওয়া যায়, যথা—বৈদেশ, যৈবন।
[৪] শুক্কুর বাইর‍্যা = শুক্রবার।
[৫] গাট্টীবুচ্‌কা = গাঠরি বোচকা।
[৬] ইহার পরে একটা ছত্র পাওয়া যায় নাই।

তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া।
সোণামুখী দইয়ল[১] লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়[২]॥
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা[৩] ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে॥
তারও সঙ্গেতে চলে মহুয়া সুন্দরী।
তার সঙ্গে পালঙ্ক সই গলা ধরাধরি॥
এক দুই তিন করি মাস গুয়াইল[৪]।
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল॥ ১—১৯

(৩)

নদের চাঁদের সভা

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান[৫]
আস্‌মানে তারার মধ্যে পূর্ণমাসীর চান॥
আগে পাছে বইছে লোক সভা যে করিয়া।
পরবেশ করিল লেংরা[৬] ছেলাম জানাইয়া॥

[১] দইয়ল = দয়েল। এই পাখীর চঞ্চু স্বর্ণবর্ণ, এজন্য ইহাকে সোণামুখী বলা হইয়াছে।

[২] রাও চণ্ডালের হাড় = রাজ-চণ্ডালের হাড় (চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড়?) বেদেরা তাহাদের বাজি করিবার সময় একটা হাড় লইয়া তাহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়া নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই হাড়ই সম্ভবত এই "রাও চণ্ডালের" হাড় হইবে।

[৩] হেজা = সেজা = শজারু।

[৪] গুয়াইল = গোয়াইল = অতীত হইল।

[৫] নদ্যার চান = নদের চাঁদ। এই নামটিতে বুঝা যায় যে গানটি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও তৎপূর্ব্ব কালের নহে, ইহা চৈতন্য প্রভুর পরবর্ত্তী, কারণ, চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে কাহারও নাম নদের চাঁদ হইতে পারিত না।

[৬] লেংরা = 'তেরা' 'লেংড়া' প্রভৃতি শব্দ ময়নামতীর গান ও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক পুস্তকে পাওয়া যায়। 'লেংড়া = খোঁড়া'; টেরা = বক্রচক্ষু। পূর্ব্বকালে রাজ-অন্তঃপুরে যাতায়াতের জন্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নিযুক্ত হইত।

"শুন শুন ঠাকুর মশয় বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তামসা দেখাইবারে॥
পরম এক সুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া ভন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো আর॥"
এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কি কাম করিল।
মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল॥
"শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্‌সা করিবারে॥
তোমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই।
আদেশ যদি কর মাগো তাম্‌সা করাই॥"
"বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে কয়ণ টেকা লাগে।"
"বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে একশ টেকা লাগে॥"
"শুন শুন নদ্যার চানরে বলি যে তোমারে।
বাইদ্যার তাম্‌সা করাও নিয়া বাইর বাড়ীর মহলে॥" ১—১৮

(৪)

খেলা-প্রদর্শন

হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে যাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
ধনু কাডি[১] লইয়া চুল তাম্‌সা করতে যাই॥
যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা ডুলে[২] যাইলো বাড়ী।
নদ্যাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি॥
এক জনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাই।
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাম্‌সা চল দেইখ্যা আই[৩]॥
চাইর[৪] দিকেতে রইল লোকজন তাম্‌সা দেখিবারে।
মধ্যে বইয়া[৫] নদ্যার ঠাকুর উকি ঝুকি মারে॥

[১] কাডি = কাটি, শর। [২] ডুলে = ঢোলে। [৩] আই = আসি।
[৪] চাইর = চারি। [৫] বইয়া = বসিয়া।

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি[1] বাশে যাইলো লাড়া।[2]
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে॥[3]
কর্‌তালের ঝুনুঝুনু ডুলে যাইলো তালি।[4]
গান করিতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকুরের বাড়ী॥
বাজী করলাম তাম্‌সা করলাম ইনাম বক্সিস চাই।
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই॥[5]
হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি।
বসত করতে হুমড়া বাইদ্যা চাইল একখান বাড়ী॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও।
নতুন বাড়ীত খাইয়া তোমরা সুখে নিদ্রা যাইও॥
পাড়া করলাম কইলৎ করলাম[6] ।
ভালা কর‍্যা বান্দ বাড়ী উলুইয়াকান্দা[7] গিয়া॥
নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বানলো জুইতের[8] ঘর।
লীলুয়া বয়ারে[9] কইন্যার গায়ে উঠলো জ্বর॥
নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা লাগাইল বাইঙ্গন[10]।
সেই বাইঙ্গন তুলতে কইন্যা জুড়িল কান্দন॥
কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্যা না কান্দিয়ো আর।
সেই বাইঙ্গন বেচ্যা দিয়াম তোমার গলায় হার॥[11]

[1] ছেরি = বালিকা।

[2] যে মুহূর্তে বেদের মেয়ে বাঁশ ধরিয়া নাড়া দিল।

[3] নদের চাঁদ উঠিয়া বলিল, 'পাছে উঁচু হইতে পড়িয়া মারা যায়।' দর্শকের কৌতূহল দূর হইয়া অন্তরঙ্গের মত আশঙ্কা জন্মিয়াছে; প্রেমের সূত্রপাত।

[4] করতালের ঝুনঝুনু শব্দের সঙ্গে বেদে-বালিকা ঢোলে তাল দিল।

[5] মুখে পুরস্কার পাওয়ার কথা বলিল, কিন্তু মনে মনে নদের চাঁদের মন প্রার্থনা করিল।

[6] এই ছত্রের কতকটা পাওয়া যায় নাই। পাড়া = পাট্টা, কইলৎ = কবুলিয়ত।

[7] বামনকান্দা গ্রামের নিকট উলুয়াকান্দা এখনও আছে।

[8] জুইতের = খুব পছন্দসই।

[9] লীলুয়া বয়ারে = ক্রীড়াশীল বায়ুতে।

[10] বাইঙ্গন = বেগুন।

[11] হুমরা বেদে মহুয়াকে লোভ দেখাইয়া সেখানে রাখিতে চাহিতেছে।

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো উরি[১]।
তুমি কইন্যা না থাকলে আমার গলায় ছুরি ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।
সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাতের বাজু ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।
সেই কলা বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মালা ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারী[২]।
চৌদিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি ॥
হাস মারলাম কইতর[৩] মারলাম বাচ্যা[৪] মারলাম টিয়া।
ভালা কইর‍্যা রাইন্ধো বেনুন কাল্যাজিরা দিয়া ॥ ১—৩৮

(৫)

নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা

এক দিন নদ্যার ঠাকুর পন্থে করে মেলা[৫]।
ঘরের কুনায়[৬] বাতি জ্বালে তিন সন্ধ্যার বেলা ॥
তাম্‌সা কইরিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী।
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি ॥
শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক ॥
সইন্ধ্যা বেলায় চান্নি[৭] উঠে সুরুয বইসে পাটে[৮]।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥

[১] উরি = শির।
[২] চৌকারী = চৌয়ারী ঘর, চৌচালা।
[৩] কইতর = পায়রা।
[৪] বাচ্যা = বাছিয়া (উৎকৃষ্ট দেখিয়া)।
[৫] মেলা = যাত্রা করা, (কৃত্তিবাসে "মেলানি" = বিদায়; এই শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে—"মেলা করিল" অর্থ রওনা হইল)।
[৬] কুনায় = কোণায়।
[৭] চান্নি = চাঁদিনী।
[৮] সুর্য্য পাটে বইসে, অস্ত যায়।

সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাঙ্কে[১] তোমার তুল্যা দিয়াম আমি॥
কলসী করিয়া কাঙ্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান[২] ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে॥
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ॥"
"শুন শুন ভিন দেশী[৩] কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা[৪] কথা আমার মনে নাই॥"
"নবীন যইবন[৫] কইন্যা ভুলা[৬] তোমার মন।
এক রাতিরে[৭] এই কথাটা হইলে বিস্মরণ॥"
"তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি॥"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলি কোথা॥"
"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর[৮] ভাই।
সুতের হেওলা[৯] অইয়া[১০] ভাইস্যা বেড়াই॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা[১১] মরি॥
এই দেশে দরদী[১২] নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা॥

১ "পক্ষীর" মত "কাঙ্কে" শব্দের "ঙ" কিরূপে আসিল বুঝা যায় না, কাঙ্কে = কক্ষে।
২ চান = চাঁদ।
৩ ভিন দেশী = ভিন্নদেশী।
৪ কইছলা = করেছিলে।
৫ যইবন = যৌবন।
৬ ভুলা = ভোলা, যাহার ভুল বা বিস্মৃতি হয়।
৭ রাতিরে = রাত্রিতে।
৮ সুদর = সহোদর। এখানে গর্ভ কথাটা দ্বিরুক্তি।
৯ সুতের হেওলা = স্রোতের শেওলা।
১০ অইয়া = হইয়া।
১১ পুইর‍্যা = দগ্ধ হইয়া।
১২ দরদী = মর্ম্ম বুঝে যে এমন লোক।

মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে[১] করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥"
ঠাকুর বলে "কইন্যা তোমার শানে[২] বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া ॥"
"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥"
"কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া ॥"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর[৩]।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥"
"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন[৪] গাঙ[৫] আমি ডুব্যা মরি ॥"

১—৪৪

(৬)

পালঙ্ক সই ও মহুয়ার কথোপকথন

"শুন শুন বইন[৬] মহুয়া আমার মাথা খাও।
একলা কেন সইন্ধ্যা[৭] বেলা জলের ঘাটে যাও ॥
সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও[৮] চউক্ষে[৯] বহে পানি।
একটি বার মনের কথা কওনা কেনে শুনি ॥
হাইম[১০] ফেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকুরবাড়ীর পানে।
নদ্যা ঠাকুর পাগল অইছে[১১] শুনছি তোমার গানে ॥"

[১] হালে = আপনার অবস্থা অনুসারে, নিজের ইচ্ছামত।
[২] শানে = পাষাণে, প্রস্তরে। [৩] তর = তোমার। [৪] গহীন = গভীর।
[৫] পূর্ব্ববঙ্গে নদীমাত্রকেই "গাঙ" (গঙ্গা) বলা হয়। [৬] বইন = বোন, ভগিনী।
[৭] সইন্ধ্যা = সন্ধ্যা। [৮] পুয়াও = পোহাও। [৯] চউক্ষে = চোখে।
[১০] হাইম = দীর্ঘনিশ্বাস। অইছে = হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মহুয়া বলে ধীরে ধীরে।
"মনের আগুন নিবাই সখি বল কেমন কইরে॥
এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন দেশেতে যাই।
বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই॥"
"শুন শুন শুন গো বইন মোর কথাটী রাখ।
সাত দিন না যাও জলের ঘাটে ঘরে বইস্যা থাক॥
আইসে যখন নদ্যার ঠাকুর বল্যা দিয়াম[১] তারে।
কাইল নিশিতে সুন্দর নারী গেছে তোমার মইরে॥"
এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে।
"আগে আমি যাইবাম মইর‍্যা মুরতেক[২] না দেখিলে॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী॥
বাইদ্যার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তথায় যাই।
আমার মন বান্‌ধ্যা[৩] রাখে এমন স্থান আর নাই॥
বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম[৪] দেশান্তরি।
বিষ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি॥" ১–২২

(৭)

হুমরা ও মাইন্‌কিয়ার পরামর্শ

"শুন শুন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই[৫]।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই॥
কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে খাইবাম[৬] ভিক্ষা মাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে[৭]॥

[১] দিয়াম = দিব।
[২] মুরতেক = মুহূর্ত্তের জন্য।
[৩] বান্‌ধ্যা = বান্ধিয়া।
[৪] অইবাম = হইব।
[৫] তোমাই = তোমাকে।
[৬] খাইবাম = খাব।
[৭] লাগে = লাগিয়া।

মাইনুকিয়া[১] বলে "এমন কথা না কহিও তুমি।
ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাড়ী জমি॥
সানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল।
পাইক্যা[২] আইছে[৩] সাইলের ধান সোনার ফসল॥
তা দিয়া কুটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা।
এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরা[৪]।" ১–১০

(৮)

গভীর নিশিতে মহুয়ার সঙ্গে নদ্যার ঠাকুরের পুনর্মিলন

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে।
সোনার[৫] কুইল[৬] কু ডাকে[৭] বইস্যা গাছে গাছে॥
আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া।[৮]
মধ্য রাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া॥
শিরে ছিল আর[৯], বাশীটি তুল্যা নিল হাতে।
ঠার দিয়া[১০] বাজাইল বাশী মহুয়ায় আনিতে॥
আসমানেতে চৈতার বউ[১১] ডাকে ঘনে ঘন।
বাশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম॥
সুখে ঘুমায় বাইদ্যার দল নয়া[১২] ঘরে শুইয়া।
ঘরের বাইর হইল কইন্যা পাগল হইয়া॥

[১] মাইনুকিয়া = মানুকে (মানিক = হোমড়ার ভাই)।
[২] পাইক্যা = পক্ক হইয়া।
[৩] আইছে = আসিয়াছে।
[৪] কিরা = শপথ।
[৫] সোনার = স্বর্ণের মত আদরের, অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ।
[৬] কুইল = কোকিল।
[৭] কু ডাকে = কুহু শব্দে ডাকে।
[৮] আগ রাঙ্গিয়া - - - পাকিয়া = শালি ধানের অগ্রভাগ রঞ্জিত হইয়া (রাঙ্গিয়া) পক্ক হইয়া উঠিয়াছে।
[৯] আর = আড়, যে বাঁশী হেলাইয়া ধরিয়া বাজাইতে হয়—কৃষ্ণের বাঁশীর মত।
[১০] ঠার দিয়া = সঙ্কেত করিয়া।
[১১] চৈতার বউ = পাপিয়া, আমরা যে পাখীকে "বউ কথা কও" বলিয়া থাকি।
[১২] নয়া = নূতন।

ধীরে ধীরে চল্যা কইন্যা নদীর ঘাটে আসি।
আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাশী॥
কোলাকোলি গলাগলি করে দুইজন।
নদ্যার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন॥
"মা ছাড়বাম[১] বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ঘর বাড়ী।
তোমারে লইয়া কইন্যা অইয়াম[২] দেশান্তরি॥"
বাইদ্যার ছেড়ী[৩] কান্দে ধইর‍্যা নদ্যার ঠাকুরের গলা।
"আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা॥
তিলেক মাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী।
পিঞ্জরায় বাইন্ধ্যা রাখছে পাগলা পঙ্খিনী[৪]॥
ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই[৫] রাখতাম ঝাইড়িয়া[৬] বানতাম[৭] বেনী॥
আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও।
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও॥"
দুইয়ে জনে এতেক করে হুমরা তাহা দেখে।
চল্যা গিয়া কতক দূর পাছে পাছে থাকে॥
রাত্রি ভোরে নদ্যার ঠাকুর ফিরে নিজের বাড়ী।
সকালবেলা চলে কইন্যা লইয়া ঘাদুরী[৮]॥ ১–২৮

(৯)

শেষ বিদায়—মহুয়ার উক্তি

"শুন শুন নদ্যার ঠাকুর বলি যে তোমারে।
এই মা গেরাম ছাড়্যা যাইবাম আজি নিশাকালে।

[১] ছাড়বাম = ছাড়িব। [২] অইয়াম = হইব। [৩] ছেড়ী = মেয়ে।
[৪] পাগলা পঙ্খিনী = পাগলা পাখীকে। [৫] ছাপাই = ঢাকিয়া।
[৬] ঝাইড়িয়া = ঝাড়িয়া। [৭] বানতাম = বান্ধিতাম।
[৮] ঘাদুরী = পাগলি (হিন্দী), কলঙ্কী।

মাও বাপে সঙ্গে কর‍্যা ছাড়্যা যাইবো বাড়ী।
তোর সঙ্গে যাইয়াম রে বন্ধু হইয়া দেশান্তরী॥
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এই না শেষ দেখা।
কেমন কর‍্যা থাকবাম আমি হইয়া অদেখা॥
আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান।
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান॥
পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইলা তুমি।
কেমুন কইর‍্যা পাগল মনে বান্ধ্যা রাখাম আমি॥
আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাশী।
আর না জাগিয়া বন্ধু পুয়াইবাম নিশি॥
মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা।
দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা॥
জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ।
ভরমিয়া তোমার সঙ্গে আর না পাইব সুখ॥
যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে॥
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর।
নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর॥
সেই খানেতে আমরা সবে বাস্যা কয় মাস থাকি।
সেই খানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি॥
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা॥
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা॥
আইজের দেখা শেষ দেখারে বন্ধু আর না হবে দেখা॥" ১—২৭

পলায়ন

" বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া নিশিতে।।"

মহুয়া, ১৭ পৃঃ

(১০)

বেদের দলের পলায়ন

"সন্দে[১] গুচ্যা[২] গেল ভাইরে আর না থাকবাম[৩] দেশে।
আমার কথা রাখ্যা চল যাইগা অন্য দেশে ॥
বাড়ী ঘর পড়্যা থাকুক থাকুক সাইলের চিরা।
এই দেশেতে না থাক্য[৪] ভাইরে আমার মাথার কিরা ॥"
বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া[৫] নিশিতে ॥
পড়্যা রইল ঘর দরজা বাড়ী জমীন পড়া।
এই কথা শুন্যা সবে লাগে চমক তারা ॥[৬]
যখন নাকি নদ্যার ঠাকুর এই কথা শুনিল।
খাইতে বইয়া[৭] মুখের গরাস[৮] ভূমিতে ফেলিল ॥
মায় ডাকে বাপে ডাকে নাহি শুনে কথা।
নদ্যার ঠাকুর পাগল হইল সকল লোকে কয় ॥ ১–১২

(১১)

মায়ের নিকট হইতে নন্তার চাঁদের বিদায়-গ্রহণ

"ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া রইছে চালে নাইরে ছানি।
পিঞ্জিরা করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্খিনী ॥
এইত উঠানে কন্যা নিরালা বসিয়া।
বিনা সূতে গাঁথ্‌ত মালা আমার লাগিয়া ॥
দিন যায় মাস যায় আর না হইবে দেখা।
আছিলাম ব্রাহ্মণের পুত্র কপালের এই লেখা ॥

[১] সন্দে = সন্দেহ। [২] গুচ্যা = গুটিয়া। [৩] থাকবাম = থাকিয়া।
[৪] থাক্য = থাকিও। [৫] আইন্ধ্যারিয়া = আঁধার।
[৬] এই কথা ... চমক তারা = এই কথা শুনিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল।
[৭] খাইতে বইয়া = খাইতে বসিয়া। [৮] গরাস = গ্রাস।

সাক্ষী হও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হওরে তারা।
বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে ॥
ভাত রাইন্দো[১] মা জননী না ফালাইও[২] ফেনা।
আমি পুত্র বৈদেশে[৩] যাইতে না করিও মানা ॥
বিদায় দেও গো মা জননী বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করতে যাইব আমি অতি দূর দেশে ॥"

মায় বলে "পুত তুমি আমার আখির তারা।
তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পারা ॥
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি।
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি ॥
ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম[৪] আমি তোমারে লইয়া।
উরের ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া ॥ [৫]
আধ পিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধ পিঠ খাইলো দারুণ মাঘ মাস্যা শীতে ॥ [৬]
বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়।
দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায় ॥ [৭]
পরবুধ[৮] না মানে পরাণ কেমনে থাকবাম[৯] ঘরে।
তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে ॥" ১—২৫

[১] রাইন্দো = রন্ধন করিও। [২] ফালাইও = ফেলিও।

[৩] বৈদেশে = বিদেশে। [৪] খাইয়াম = খাইব।

[৫] উরের ধন - - - ছাড়িয়া = আমার বক্ষের রত্ন দূরে ফেলিয়া দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

[৬] আধ পিঠ - - - শীতে = ছেলের মলমূত্রে মাতার অর্দ্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হইল (খাইল)। বাকী পৃষ্ঠদেশ মাঘ মাসের শীতে ক্ষয় পাইল। এত কষ্টে তোমাকে পালন করিয়াছি।

[৭] বিদেশে - - - মায় = বিদেশে বিপদে পড়িয়া যদি পুত্র মারা পড়ে, তবে দেশের কোন লোক তাহা জানিবার পূর্ব্বে মায়ের মনে তাহা আগেই টের পায়। মাতৃহৃদয় এতটা স্নেহপ্রবণ ও শঙ্কাতুর।

[৮] পরবুধ = প্রবোধ। [৯] থাকবাম = থাকিব।

(১২)

নদের চাঁদের নিরুদ্দেশ

রাত্রি নিশাকালে পুত্র কি না কাম করিল।
উরদিশে[১] মায়ের পায়ে পন্নাম করিল॥
"সাক্ষী হইও চান্দ সূরুয সাক্ষী হইও তুমি।
ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আজি বৈদেশী হইলাম আমি॥
মা রইলো বাপ রইলো রইলো রে সুদুর[২] ভাই।
সকল থাকিতে আমার কেউ যেন নাই॥
চান্দ সূরুয পন্নাম করি পন্নাম করি সবে।
মায় বাপে পন্নাম করি যাইব বৈদেশে॥"
রাত্র নিশাকালে ঠাকুর কি কাম করিল।
বাইদ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল॥ ১-১০

(১৩)

মহুয়ার সন্ধানে নদের চাঁদের ভ্রমণ

কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাইদ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভর্‌মে তিরভুবন[৩]॥
একমাস দুইমাস আরে ভালা তিনমাস যায়।
খুঁজ্যা না পাইল দেখা ভর্‌মিয়া বেড়ায়॥
কোথায় আছে জইতার পাহাড়[৪] কোথায় গহীন বন।
পাগল হইয়া নদীয়ার চাঁন ভর্‌মে তিরভুবন॥
পন্থে যারে দেখে ঠাকুর তারে ডাক দিয়া পুছ করে[৫]।
"বিদেশী বাইদ্যার লাগাল পাইবাম কত দূরে॥

[১] উরদিশে = উদ্দেশে। [২] সুদুর = সহোদর। [৩] তিরভুবন = ত্রিভুবন।

[৪] "জইতার পাহাড়ের" কথা মহুয়া নদের চাঁদকে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিল। ইহা গারো পাহাড়ের অন্তর্গত।

[৫] পুছ করে = জিজ্ঞাসা করে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে মুসলমানেরা "পুছ করে" কথা ব্যবহার করিয়া থাকে; "পৃচ্ছ" শব্দের অপভ্রংশ।

গরু রাখ রাউখাল[১] ভাইরে কর লড়ালড়ি[২]।
এই পন্থে যাইতে নি দেখ্‌ছ[৩] মহুয়া সুন্দরী॥
মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী॥
বাঁশ বাইয়া বাজী করে সুন্দর বাইদ্যার নারী।
চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী॥
আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জলে।
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জলে মণি।
সেইত কন্যার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি॥
এই ঘাটে ভরিত জলরে আরে ভালা[৪] মহুয়া সুন্দরী।
এই ঘাটে কেন আমি ডুইবা নাইসে মরি॥
এই পন্থে চলিত কন্যা কলসী কাঙ্কে লইয়া।
দূরে থাক্যা আমি রূপ ভালা দেখ্‌তামরে[৫] চাহিয়া॥
কোথায় গেলে পাব কন্যা আরে তোমার দরশন।
তিলেক আদেখা হইলে আছি৷ মরণ॥
উইড়া[৬] যাওরে পশুপক্ষা নজর বহুদূর।
এই না পন্থে বাইদ্যার দল গেছে কতকদূর॥"

যেইখানে বসিয়া কন্যা করিত রন্ধন।
তথায় বইসা নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন॥
ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস।
এইখানে আছিল কন্যা ফাল্গুন-চইতের[৭] মাস॥[৮]
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ না মাস গেল এই মতে।
কাইন্দা বেড়ায় নদীয়ার ঠাকুর উচা নীচা পথে॥

[১] রাউখাল = রাখাল।
[২] লড়ালড়ি = ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি।
[৩] দেখ্‌ছ = দেখেছ।
[৪] ভালা = ভাল।
[৫] দেখতামরে = দেখিতাম রে (আমি যদি কাছে থাকিতাম)।
[৬] উইড়া = উড়িয়া।
[৭] চইতের = চৈত্রের।
[৮] ঘোড়ার পায়ের - - - মাস = বেদেদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ও ছাগলে খাওয়া ঘাস দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বেদের দল ফাল্গুন ও চৈত্র মাস সেইখানে কাটাইয়াছে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এইরূপে যায়।
পুবেতে গর্‌জিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়[১] ॥
ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে।
দিন রাইত নদীয়ার ঠাকুর খুঁজে নানান মতে ॥
বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায়।
খালি মণ্ডপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকুরের দায়[২]
মাও রইল বাপ রইল রইলরে সোদর ভাই।
মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া রজনী পোয়াই ॥[৩]
কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক বরত[৪] পুত্রের লাগিয়া।
আক্ষি ঘোর[৫] হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আগুণ[৬] মাসে অল্প শীত কংসাই নদীর পাড়ি[৭]।
লাগাল পাইল নদীয়ার চান্ মহুয়া সুন্দরী ॥
সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥ ১—৪৫

(১৪)

নূতন অতিথি

সন্ধ্যাবেলা অতিথ আইল ভিন্ন দেশে বাড়ী।
কলসী লইয়া জলে যায় মহুয়া সুন্দরী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যার যৌবন হইল কালী।
দলের যত বাইদ্যা-লোক করে বলাবলি ॥
"নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছুঁয়ে ভাতপানী
মাথার বিষেতে কন্যা হইল পাগলিনী ॥

[১] ভায় = 'ভাতি' শব্দ হইতে; প্রকাশ পায়। [২] দায় = জন্য।
[৩] মেঘে ... পোয়াই = বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও রৌদ্রে পুড়িয়া রজনী যাপন করে।
[৪] বরত = ব্রত। [৫] আক্ষি ঘোর = চক্ষু ঘোর অর্থাৎ নিষ্প্রভ হইল।
[৬] আগুণ = অগ্রহায়ণ। [৭] পাড়ি = পাড়ে।

সর্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা আইঞ্চল পাতিয়া।
ছয় মাস যায় কন্যার কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
ভাত নাই সে রান্ধে কন্যা খেলায় নাই সে মন।
এইরূপ হইয়াছিল কন্যা সংশয় জীবন ॥
আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা।
ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা ॥" [১]

দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন।
জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোঞ্জন ॥ [২]
হোম্‌রা বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কা ওরে ভাই।
"ভিন্ দেশী অতিথে আজ করিব পরখাই[৩] ॥"
"আমার কাছে থাক ঠাকুর সুখে কর বাস।
দেশে দেশে ঘুইরা ফিরবা লইয়া দড়ি•বাঁশ ॥
যত্ন কইরা শিইখ খেলা থাক্যো মোদের পাশে।
বার মাস ঘুইরা[৪] আমরা ফিরি দেশে দেশে ॥" ১—২০

(১৫)

নদের চাঁদের প্রাণবিনাশার্থ হোম্‌রা কর্ত্তৃক মহুয়াকে ছুরিকা-প্রদান

অন্ধকাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা আসমানে জ্বলে তারা।
ভাবিয়া চিইন্ত্যা হোম্‌রা বাইদ্যা উইঠ্যা হইল খারা ॥
নদীর পারে হিজল গাছ পাতার বিছানা।
নদীয়ার ঠাকুর শুইয়া আছে হইয়া মইতানা[৫] ॥

[১] ভাবিয়া - - - খারা = ভাবিতে ভাবিতে মহুয়ার রং কাল হইয়া গিয়াছে। বেদের দলের লোকেরা বলাবলি করিতেছে, 'মহুয়ার কি ভয়ানক শিরঃপীড়া হইয়াছে যে, সে রাত্রে ঘুমায় না। অনুজল সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমনই ব্যথা হইয়াছিল যে, গত ছয় মাস সে একরূপ আঁচল (আইঞ্চল) পাতিয়া শুইয়া থাকিত। সে আর নিজে ভাত রান্না করিত না—বেদেদের খেলায়, তাহার আর আগ্রহ দেখা যাইত না। আজ কেন অকস্মাৎ এমন হইল, যে ব্যক্তি ছয় মাস কাল মৃতবৎ পড়িয়াছিল সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল?' [এতদ্দ্বারা অতিথির (নদের চাঁদের) আগমনজনিত মহুয়ার আনন্দ সূচিত হইতেছে।]

[২] ভোঞ্জন = ভোজন। জাতি - - - ভোঞ্জন = আজ নদের চাঁদ ব্রাহ্মণ হইয়া মহুয়ার রাঁধা ভাত খাইয়া জাতি নষ্ট করিলেন।

[৩] পরখাই = পরীক্ষা। [৪] ঘুইরা = ঘুরিয়া।

[৫] মইতানা = মত্ত হইয়া, বহু দিনান্তে মহুয়ার দর্শন পাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

এই দিনে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কন্যার শিওরা[১] বইসা ডাকে ঘন ঘন॥
"উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও।
আমি তোর বাপ ডাকি আঁখি মেলি চাও॥
ষোল বছর পালিলাম কত দুঃখ করি।
এক কথা রাখ মোর মহুয়া সুন্দরী॥"

ঘুমাইয়া কাণের কাছে দেওয়ার গরজন।
ভিন্ দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন॥
চম্‌কিয়া উঠিল কন্যা বাপের ডাক শুনি।
চোখ্ চাইয়া দেখে কন্যা জলন্ত আগুনি॥
"এই ছুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পারে।
শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইরা আইস তারে॥
ষোল বচ্ছর পাল্‌লাম কন্যা কত দুঃখ করি।
আমার কথা রাখ তুমি মহুয়া সুন্দরী॥
ভিন্ দেশী দুষমন সেই যাদুমন্ত্র জানে।
বইক্ষেতে[২] হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে॥
আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও।
দুষমনে মারিয়া ছুরি সাওরে[৩] ভাসাও॥"

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী[৪] চান্নীর[৫] রাইত আবে[৬] পড়্‌ল ঢাকা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল॥
পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি।
উপায় চিন্তিয়া[৭] কন্যা হইল উন্‌মাদিনী॥ ১—২৮

[১] শিওরা = শিওরে। [২] বইক্ষেতে = বক্ষে। [৩] সাওরে = সাগরে, নদীতে।
[৪] সুনালী = সোণালী। [৫] চান্নীর = চাঁদিনী, জ্যোৎস্নাময়ী। [৬] আবে = অন্ধে, পাতলা মেঘে।
[৭] চিন্তিয়া = চিন্তা করিতে করিতে (কিছু স্থির করিতে না পারিয়া)।

(১৬)

প্রেমের জয়

পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া বসিল শিওরে।
নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে॥
আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।
নিদ্রা যায় নদীয়ার চান্ অচৈতন্য হইয়া॥
একবার দুইবার তিনবার করি।
উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের[১] ছুরি।
"উঠ উঠ নদ্যাঠাকুর কত নিদ্রা যাও।
অভাগী মহুয়া ডাকে আখি মেইল্যা চাও॥
পাষাণ বাপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে।
কিরূপে বধিব তোমায় নাহি লয় চিতে॥
পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া॥
জ্বালিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।[২]
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই॥
তুমারে[৩] মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে।
পাষাণ হইয়া মাও বাপে বধিল আমারে॥
কাজ নাই ভিন্ দেশী বন্ধুরে দুঃখ নাইসে করি।
আমার বুকে মারবাম আমি এই বিষলক্ষের ছুরি॥"

কি কর কি কর কন্যা কি কর বসিয়া।
কাঞ্চা ঘুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া॥
শিওরে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দরী।
হাতে তুইল্যা লইছে কন্যা বিষলক্ষের ছুরি॥

[১] বিষলক্ষের = যাহার অগ্রভাগ বিষাক্ত।

[২] জ্বালিয়া - - - নিবাই = ঘি দিয়া পবিত্র দীপ জ্বালিয়া নিজেই ফুঁ দিয়া নিবাইব? (নিজেই নিজেদের এই পবিত্র প্রেমের ধ্বংস করিব?)

[৩] তুমারে = তোমাকে।

"শুন শুন ঠাকুর আরে শুন মোর কথা।
কঠিন তোমার প্রাণ-পিওয়া[১] কঠিন মাতা-পিতা ॥
শাণে বান্ধা হিয়া আমার পাষাণে বান্ধা প্রাণ।
তোমায় বধিতে বাপে কহিল সইন্ধান ॥
হাতেতে আছিল মোর বিষলক্ষের ছুরি।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু আমার বুকে মারি ॥
পলাইয়া মায়ের ধন নিজের দেশে যাও।
সুন্দর নারী বিয়া কইরা সুখে বইসা খাও ॥
বরামণের[২] পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল।
তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল ॥
কি করিতে কি করিলাম নাহি পাই দিশা।
অরদিশ[৩] হইয়া আমি———— ॥"

"মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল[৪]।
ভমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল ॥
তোমার লাগিয়া কন্যা ফিরি দেশ বিদেশে।
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা আর না যাইবাম দেশে ॥
কি কইবাম বাপ মায়ে কেমনে যাইবাম ঘরে।
জাতি নাশ কর্‌লাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে ॥
তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ী।
এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি ॥"

"পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর[৫]।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর ॥
দুই আঁখি যে দিগে যায় যাইবাম সেই খানে।
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বনে ॥
বাপের আছে তাজি ঘোড়া ঐ না নদীর পারে।
দুইজনেতে উঠ্যা চল যাইগো দেশান্তরে ॥

[১] পিওয়া = প্রিয়া। মহুয়া নিজেকেই কঠিন বলিতেছে। [২] বরামণের = ব্রাহ্মণের।
[৩] অরদিশ = দিশাহারা। [৪] মাও ছাড়ছি—এই স্থান হইতে নদের চাঁদের উক্তি।
[৫] এই ছত্র হইতে মহুয়ার উক্তি।

না জানিবে বাপ মায় না জানিবে কেহ।
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী কইরা ছাইড়া যাইবাম দেশ॥"
আবে করে ঝিলীমিলী[১] নদীর কুলে দিয়া।
দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া॥
চান্দ-সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে[২] উড়িল॥ ১—৫৪

(১৭)

সম্মুখে পার্ব্বত্য নদী ; নদের চাঁদ ও মহুয়া তীরে দাঁড়াইয়া

"বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাও।
যেই দেশেতে বাপ মাও সেই দেশেতে যাও॥
বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার কন্যা মহুয়ারে খাইছে জংলার[৩] বাঘে॥"
লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপা[৪]।
ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যথায় বাদ্যার দফা[৫]॥

"বিস্তার[৬] পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পারি॥
চর পইড়া যাওরে নদী দুইচার দণ্ডের লাগি।
পার হইয়া যাইবাম মোরা এই ভিক্ষা মাগি॥"
নদীতে না পড়ল চর উজান বাঁকে পানি।
"এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি॥
পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল।[৭]
এই গে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল॥

[১] আবে করে ঝিলীমিলী = অভ্রের (পাতলা মেঘের) উপর কিরণ-রেখা ঝিকিমিকি করিতেছিল।
[২] শণেতে = শূন্যেতে। [৩] জংলার = জঙ্গলের। [৪] থাপা = থাপর।
[৫] দফা = (বেদেদিগের) অশ্ব রাখিবার স্থান। [৬] বিস্তার = প্রশস্ত।
[৭] পক্ষী নয় ... পাল = নৌকার পাল দেখিয়া প্রথমতঃ দূরত্ববশতঃ পক্ষী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তারপর সেই ভ্রম দূর হইল।

শুন্‌রে ভিন দেশী সাধু বাণিজ্যকারণ।
কত দেশে যাওরে তোমরা ভরম তিরভুবন॥
গইন[১] গম্ভীরা নদী সাঁতার না জান।
পার কইরা দিলে বাঁচে এ দুটা পরাণি॥"

কন্যারে দেখিয়া সাধু মন হইল পাগল।
মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়া কয় সদাগর॥
কূলেতে ভিরায় নাও উঠে দুইজন।
চলিল সাধুর নাও পবনগমন॥ ১—২২

(১৮)

সাধুর ডিঙ্গায়

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কন্যারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন॥
দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল।
মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়া সাধু সল্লা[২] যে করিল॥
উজান পাকে সাধুর ডিঙ্গা উজাইয়া যায়।
জলে ভাসে নদ্যার ঠাকুর ঘট্‌লো একি দায়॥
বানের মুখে কালা ঢেউ পাক দিয়া করে তল।[৩]
ঢেউয়ের পাকে[৪] ন্যার ঠাকুর পইড়া হইল তল॥

"না দেখিল[৫] বাপে আরে না দেখিল মায়।
পড়িয়া দুশ্মনের হাতে আমার প্রাণ যায়॥
বিদায় দেও কন্যা আরে এই না বিদায় মাগি।
তোমার আমার শেষ দেখা ইহ জন্মের লাগি॥"

[১] গইম = গহীন (গভীর)।

[২] সল্লা = পরামর্শ (সাধারণতঃ 'কুপরামর্শ' অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

[৩] বানের মুখে - - - তল = প্রবল বানের সম্মুখে কালো বর্ণ ঢেউ চক্রের সৃষ্টি করিয়া যাহা পড়ে তাহা তল করিয়া ফেলে। পাক = চক্র, এখনও 'পাকচক্র' শব্দ কথায় ব্যবহৃত হয়।

[৪] পাকে = ঘূর্ণিতে, চক্রেতে।

[৫] দেখিল = দেখিলাম।

"যে ঢেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদীয়ার চান।
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরাণ।।"
ঝম্প দিতে সুন্দর কন্যা মাঝিমাল্লায় ধরে।
কি কাম করিল হায় দুষ্মন সদাগরে।।

"কাল না ভাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল।
বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল।।
এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ।
আমারে ভজহ কন্যা রাখহ মোর মন।।
এমন সোনার পান্সী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই।।
ফুলে ভরা মধু কন্যা ফির একেশ্বরী।
তোমারে পাইলে আমি বাঞ্ছা পূণ করি।।
বসনভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী।
নাকে কানে দিব ফুল কাঞ্চা[১] সোনায় গড়ি।।
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধা দিবাম কেশ।
ঘরে আছে দাসীবান্দী তোমার নাই ক্লেশ।।
শয্যা তারা পাইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া।
সুবর্ণ পালঙ্কে তুমি থাকবা কন্যা বইয়া[২]।।
শীতের রাইতে দুঃখ নাই লেপ তুলাভরা।
মন যোগাইতে দাসী তোমার সাম্‌নে থাকুব খারা।।
হাতীঘোড়া আছে আমার লোকলস্কর।
সবার ঠাকুরাইন[৩] হইয়া থাকবা আমার ঘর।।
বাড়ী পাছে শানে বান্ধা চারি কোনা পুষ্কুনি।
সেই ঘাটেতে আমার সঙ্গে সাঁতার দিবা তুমি।।
অন্দর ময়ালে[৪] আমার ফুলের বাগান।
দুইজনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান[৫]।।

[১] কাঞ্চা = কাঁচা। [২] বইয়া = বসিয়া। [৩] ঠাকুরাইন = ঠাকুরাণী।
[৪] ময়ালে = মহলে। [৫] সকাল ও বিয়ান = খুব ভোরে ও প্রাতঃকালে।

রাত্রিকালে শুইব দোয়ে জোর মন্দির ঘরে[১]।
শীতের রজনীতে কন্যা থাকবা আমার উরে॥
শয্যায় পাইলে বেথা শুইবা আমার বুকে।
বানাইয়া পানের খিলী তুইল্যা দিবাম মুখে॥
আমি খাইবাম তুমি খাইবা কন্যা থাকবাম দুইজনে
তোমায় লইয়া যাইবাম বাণিজ্যকারণে॥
হীরামণি যথায় পাইবাম ভালা বান্যা[২] দিয়া।
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়া॥
আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখা।
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাখা[৩]॥
উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মুল।
হীরামণি দিয়া তোমার জুইরা দিবাম চুল॥
চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ।
নুপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত॥"

এতেক শুনিয়া মহুয়া কি কাম করিল।
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল॥
পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল।
চুন-খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল॥
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে।
রসের নাগইরা[৪] পান খায় সুখে॥

[১] প্রাচীন বাঙ্গালায় এই "জোর মন্দির" শব্দ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, গোবিন্দচন্দ্রের গান দেখ।
[২] বান্যা = বায়না, দাম। ভালা বান্যা = বেশী মজুরী দিয়া।
[৩] কামরাঙ্গা শাখা = কামরাঙ্গা ফলের মত পলকাটা শাঁখা।
[৪] রসের নাগইরা = রসপূর্ণ নাগরিয়া, রসিক নাগর।

"কি পান দিছলো কন্যা গুণের অন্ত নাই।
বাহুতে শুইয়া তোমার আমি সুখে নিদ্রা যাই॥" [১]

পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিষে পরে ঢলি।
নৌকার উপরে কন্যা হাসে খলখলি॥
বিষলক্ষের ছুরি কন্যার কাকলে আছিল।
তা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল॥
অচৈতন্য হইয়া সাধু পড়িয়াছে নায়।
কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায়॥
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর।
ভরা সহ সাধুর নাও ডুইবা হইল তল॥ ১—৬৮

(১৯)

নদীর পরপারে বন, মহুয়ার নদের চাঁদকে খোঁজা

"কোন গইনে[২] ফুটে ফুলরে কোথায় জ্বলে মণি।
বিধাতা শিরজিল কন্যা জনমদুঃখিনী॥
কও কও কও পক্ষী আরে কও তরুলতা।
ঢেউয়ের কুলে[৩] পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা॥
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাও।
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া[৪] জানাও॥
জলে থাক জলের কুম্ভীর সদা দেখতে পাও।
কোথায় ভাস্যা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাও॥
আছিলাম বাদ্যার নারী ভরমিতাম দেশ দেশ।
পরদেশী বন্ধুরে লইয়া ছাড়িলাম দেশ॥

[১] কি পান ... যাই = সদাগরের উক্তি, পানের এরূপ গুণপনা যে আমার এমন নেশা লাগিয়াছে যে আমি আর বসিতে পারিতেছি না—তোমার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইব।

[২] গইনে = গহন বনে। [৩] কুলে = কোলে।

[৪] পরখাইয়া = প্রত্যক্ষ করিয়া বা পরীক্ষা করিয়া।

ডালেতে বসিয়া আছ ময়ূরাময়ুরী।
তোমরা কি জানহ কথা কহ সত্য করি॥
দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।[১]
বিধাতা করিল দুঃখী দুষ[২] বা দিয়াম কার॥ ১—১৪

(২০)

পর্ব্বতে বনপথ; অদূরে ভগ্ন দেবমন্দির

সন্ন্যাসীর পালা।

"গাছে না পাইলাম ফল দূরে নদীর পানি।
খিদায় অবশ অঙ্গ না বঁচে পরাণি॥
বড় বড় বাঘভালুক দূরে সইরা[৩] যায়।
অভাগ্যা মহুয়ায় দেখ্যা ফিইরা নাহি চায়॥
আকাল মাকাল[৪] অজগইরা[৫] হরিণ ধইরা খায়।
দুঃখিনী মহুয়ায় দেখ্যা দূরে চল্যা যায়॥
"জমিনে না গছে[৬] মোরে নদীতে নাই ঠাই।
এমন প্রাণের বন্ধু আমি কোথায় গেলে পাই॥
আমার লাগিন ছাড়ল সে যে সুখের ঘর বাসা।
আমার লাগিন লইল নদীর কূলে বাসা॥
দুষমন হইল সাধু আমার লাগিয়া।
পরাণ হারাইল বন্ধু জলেতে ডুবিয়া॥
এইনা নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।
বৃক্ষ ডালে ফাঁস দিয়া পরাণ তেজিব॥

[১] দরিয়ার - - - হার = নদীর মধ্যে আমার গলার হার ডুবিয়া পড়িয়াছে (নদের চাঁদ জলে ডুবিয়াছে)।
[২] দুষ = দোষ।
[৩] সইরা = সরিয়া।
[৪] আকাল মাকাল = বিপরীত আকার, প্রকাণ্ড।
[৫] অজগইরা = অজগর সাপ।
[৬] গছে = গ্রহণ করে।

"না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি[১]।
জঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণি॥"

ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে সাপে করে বাসা।
সন্ধ্যাবেলা যায় কন্যা রাইত থাকবার আশা॥
শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড়।
মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার॥
চিনিতে না পারে কন্যা সুন্দর নয়ান।
লক্ষিয়া দেখিল কন্যা এই ঠাকুর নদ্যার চান্॥

শিরে বান্দা জটা চুল লম্বা মুছ[২] দাড়ি।
আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি[৩]॥
কন্যা দেখি সন্ন্যাসী যে ভাবে মনে মন।
এ কোন বিধির কাম ঘটিল এমন॥
"শুন শুন কন্যা আরে বলি যে তোমারে।
কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দূরে॥
কোন বা রাজার কন্যা দিলা বনবাসে।
কিবা পাপ কইরা ছিলা নবীন বয়সে॥
কঠিন তোমার মাতাপিতা শানে বান্দা হিয়া।
প্রাণে কেমনে বাইচা আছে তোমারে বনে দিয়া॥"

(আরে ভালা) এই কথা শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীর পায় ধরি কান্দিতে লাগিল॥
হিঙ্গলা পিঙ্গলা জটা কটা মুছ দাড়ি[৪]।
সন্ন্যাসীর পায় কন্যা যায় গড়াগড়ি॥
আগগুড়ি[৫] যত কথা জানায় সন্ন্যাসীরে।
শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে লাগে কইবারে॥

[১] আরও দেখি শুনি = আরও ভাল করিয়া সন্ধান করিব।
[২] মুছ = মোছ, গোঁফ।
[৩] খড়ি = লাঠি।
[৪] কটা মুছ দাড়ি = গোঁফ ও দাড়ি কটাবর্ণ।
[৫] আগগুড়ি = আগাগোড়া আদ্যন্ত।

"বনে আছে গাছের পাতা তুইল্লা[১] দিবাম আমি।
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী॥[২]
দারুণ আকাল্যা জ্বর[৩] হাড়ে লাগ্যা আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইয়া না সে গেছে॥
শ্বাসেতে ধরিয়া[৪] পাতা আন নদীর পানি।
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরাণি॥"

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
চারি দিনে নদ্যার চান আঁখি মেলি চায়॥
ডাক দিয়া সন্ন্যাসী কয় অতি ভোরবেলা।
"আমার ফুল তুলবে কন্যা যাইও একেলা॥"
ফুল তুলিবারে কন্যা যায় দূর বনে।
নিত[৫] নিত পূজার ফুল হাজি[৬] ভইরা আনে॥
উট্টা বসে নদ্যার চান খাইত চায় ভাত।
তা শুন্যা মহুয়া কান্দে শিরে দিয়ে হাত॥
"কোথায় পাইবাম ভাত আমি এই গইন বনে।"
ফুল নাহি তুলে কন্যা থাকে অন্যমনে॥[৭]

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
কন্যার যইবন[৮] দেখি মনির[৯] ভুলে মন॥
আট্‌কা টাট্‌কা পূজার ফুল হাজি ভরা থাকে।[১০]
নিশি রাত্রে[১১] মনি আইস্যা মহুয়ারে ডাকে॥

[১] তুইল্লা = তুলিয়া।

[২] এই গাছে - - - পরাণী = এই যে গাছের পাতা আমি তুলিয়া দিতেছি, তাহাতেই তোমার পতির জীবন বাঁচিবে।

[৩] আকাল্যা জ্বর = কাল-জ্বর, বিষম-জ্বর। [৪] শ্বাসেতে ধরিয়া = নিশ্বাস রোধ করিয়া।

[৫] নিত = নিত্য। [৬] হাজি = সাজি।

[৭] ফুল - - - অন্যমনে = নদের চাঁদকে ভাত দিতে না পারিয়া মহুয়া ফুল তুলিতে যায় না, বিমর্ষভাবে ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। [৮] যইবন = যৌবন। [৯] মনির = মুনির।

[১০] আট্‌কা - - - থাকে = যদিও গন্ধ-তোলা ফুলে সাজি পূর্ণ, তথাপি।

[১১] নিশি রাত্রে = গভীর রাত্রিতে।

"উঠ উঠ কন্যা আরে কত নিদ্রা যাও।
পরাণে বাঁচাইলে পতি আমার কথা রাখ॥
আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে॥"

আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা চলে মুনির সাথে।
নদীর কিনারে কন্যা গেল গহীন পথে॥
মুনি বলে "কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন॥
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ[১]।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ॥"

আগল পাগল ভাঙ্গা মন খানি জুড়া।[২]
সন্ন্যাসীর কথা শুন্যা শিরে পড়ে খাড়া[৩]॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীরে বুজাইয়া কহিতে লাগিল॥
"স্বামীরে বাঁচাও আগে সত্য করি আমি।
যাহা চাও তাহা দিব বাঁচাইলে পরাণি॥"

এই কথা শুনিয়া মুনির মুখ হইল কালী।
ফিরিয়া কহিছে "কন্যা শুন তবে বলি॥
দুই দিন সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর।
নিজে খাওয়াইয়া বিষ পতিকে না মার॥"

রাইক্ষসের[৪] হাতে পড়ি না দেখি উপায়।
মনে মনে চিন্তে কন্যা কিমতে পলায়॥

[১] যুগ = যোগ।

[২] আগল পাগল - - - জুড়া = মহুয়ার মন জুড়িয়া স্বামীর চিন্তা—তজ্জন্য সে পাগলের মত হইয়া আছে ও তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

[৩] খাড়া = খড়্গ।

[৪] রাইক্ষস = রাক্ষস, এই 'ই'কার পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে প্রচলিত আছে, যথা 'রাত'-স্থলে 'রাইত', 'কাল'-স্থলে 'কাইল' 'আজ'-স্থলে 'আইজ'।

এক দিন যুক্তি করে নদের চান্দে লইয়া।
কিরূপে যাইবে কন্যা দূরে পলাইয়া॥
তেরালেঙ্গা[১] দেহখানি (আরে ভালা) অন্নে করছে সাড়া।
হাটায়া যাইতে নাই সে পারে উঠ্যা না হয় খাড়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
আস্তে ব্যস্তে নদ্যার চান্দে কান্দে তুইলা লইল॥
নিশি কালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ সন্ন্যাসী যদি পন্থে লাগাল পায়॥ ১—৮৮

(২১)

বনস্পতি

এক দুই তিন করি ভালা[২] ছয় মাস গেল।
ভালা[৩] হইয়া নদ্যার ঠাকুর উঠিয়া বসিল॥
ঝরনীর জল আনে কন্যা আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নদীয়ার চান্দের গায়ে হইল বল॥
পার ডিঙ্গাইয়া যায় নদ্যার ঠাকুর সাথে।
অনক দূরতে দুই জনা গেল এই মতে॥

"বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি
উইয়া[৪] ঘুইয়া[৫] ফিরি যেমন বনের পশুপংখী॥

[১] "তেরালেঙ্গা" = তিন ঠাঁই ভাঙ্গা, এই শব্দটিও প্রাচীন অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। পূর্বে বড়লোকেরা খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ লোক অন্তঃপুরে রাখিতেন। খোজাদের মত তাহাদেরও খবরাখবরের জন্য অন্তঃপুরে গতাগতি ছিল। এখানে অবশ্য নদের চাঁদের পীড়া হেতু।

[২] এই ভালা শব্দ গানের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়, ইহা গানের মাঝখানে একটা অবস্থাপনসূচক অর্থশূন্য শব্দ, গানের ছন্দ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। ইহার সাধারণ অর্থ "ভাল"।

[৩] এই "ভালা" অর্থ 'সুস্থ', 'ভাল'।

[৪] উইয়া = উড়িয়া। [৫] ঘুইয়া = ঘুরিয়া।

সাম্‌নে পাহাড়ীয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।
বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায়॥
"এইখানে বাঁধ কন্যা নিজের বাসা ঘর।
এইখানে থাকিয়া মোরা কাটাইব দিন॥
সাম্‌নে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবস রজনী॥
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরনীর জল॥"

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা।
বাদ্যার ছেরি[১] মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা[২]॥
নদ্যার চান্দের জ্বর উঠ্‌ছে মাথায় বেদনা তাত[৩]।
বাদ্যার ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায়[৪] হাত॥
হাটে যায় রে নদ্যার চান কোনাকুনি[৫] পথ।
বাদ্যার ছেরি ডাক্যা বলে "কিন্যা আইন নথ"[৬]॥
বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খায়।
মালাম[৭] পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়॥
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোহে ভরমে নানান সুখে॥
হস্ত ধরি সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন।
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ[৮]॥

[১] ছেরি = মেয়ে।

[২] নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছে, সেইজন্য তাঁহার জন্য দেবতাকে কালো ও ধবল পাঠা মানত করিতেছে।

[৩] তাত = তদ্রূপ। [৪] বোলায় = বুলায়। [৫] কোনাকুনি = সোজা।

[৬] শেষ ছয় ছত্রে পুণরীদের গৃহস্থালীর কয়েকটি মনোজ্ঞ বিভিন্ন দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

[৭] মালাম = পদচিহ্নযুক্ত। [৮] ভইক্ষণ = ভক্ষণ।

বাপে ভুলে মায় ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী[১] ॥
মনের সুখে দুইজনে কাটে দিন রাত।
শিরেতে পড়িল বাজ এই অকরসাত[২] ॥ ১–৩২

(২২)

বনে পর্য্যটন ও বিপদ

একদিন নদ্যার চান দিনের[৩] সন্ধ্যাবেলা।
সঙ্গেতে সুন্দর কন্যা পন্থে করে মেলা[৪] ॥
কত দূরে দুইজনে গলায় ধরাধরি।
গহীন[৫] বনেতে গেল লয়ে সুন্দর নারী ॥
পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর।
সুন্দর কন্যা কোলে লইয়া বসিল ঠাকুর ॥

কত দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এমন সময় কন্যা শুনে বংশীর ধ্বনি ॥
চমকিয়া উঠে কন্যা, কহিল ঠাকুর।
"কি কারণে কন্যা তুমি অইলা চঞ্চল ॥
কি কারণে কন্যা তোমার বিরস বদন।
পরকাশ কইরা কহ কন্যা জন্ম-বিবরণ ॥
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কোথায় বাস কর।
বাদিয়ার সঙ্গেতে কেন দেশে দেশে ফির ॥
পুইধ[৬] করিয়া আমি উত্তর না পাই।
আজি দিনে এই কথা শুন্তে আমি চাই ॥

১ পেয়ারী = প্রিয়জনদিগকে।   ২ অকরসাত = অকস্মাৎ।

~~৩ বিহনা = এই শব্দটির এখানে বিশেষ~~

৪ মেলা = রওনা হওয়া, এই "মেলা করা" কথাটা এখনও পূর্ববঙ্গে খুব প্রচলিত। এই শব্দের রূপান্তর "মেলানি" কথা কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের কাব্যে বিস্তর পাওয়া যায়।   ৬ পুইধ = প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলে কেন মুছ চক্ষের পানি।
দরদ লাগিছে তোমার কাতরা হইছে প্রাণী ॥
অর্দ্ধেক শুনাইলে কথা সেদিন বিয়ানে[1]।
ছুটু[2] কালে ছময়া বাইদ্যা চুরি কইরা আনে ॥
ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।
সন্ধ্যা গুঞ্জরীয়া গেল চল বাসে যাই ॥"

"কাইলী[3] যদি বাচিরে বন্ধু কইবাম সেই কথা।
আজি কেন উঠ্‌লরে বন্ধু দারুণ মাথার ব্যথা ॥"
বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি।
নদ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইরা[4] গেল এলি[5] ॥
"কোন সাপেরে জানি কন্যা করিল দংশন।
আজি কেন কন্যা তোমার এমন হইল মন ॥"
শুকনা পাতার বাসর[6] ভাঙ্গে মড়মড়ি।
তাহার মধ্যে বসে কন্যা মহুয়া সুন্দরী ॥
আতঙ্কে কন্যার গায়ে কাল্যাজ্বর[7] আগে।
ঢলিয়া পড়িল কন্যা দারুণ মাথার বিষে ॥

"একটুখানি শুয় কন্যা লইয়া আসি জল।"
অবশ হইল কন্যা অঙ্গে নাই সে বল ॥
কান্দিয়া মহুয়া কয় "এই শেষ দিন।
সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন ॥
দূর বনে বাজল বাঁশী শুন্যাছ সে কানে।
আসিছে বাদ্যার দল বধিতে পরাণে ॥
আমারও পালং সই বাঁশী বাজাইল।
সামাল[8] করিতে পরাণ ইসারায় কহিল ॥

[1] বিয়ানে = প্রভাতে। [2] ছুটু = ছোট।
[3] কাইলী = কা'ল। [4] পইরা = পড়িয়া। [5] এলি = এলাইয়া।
[6] বাসর = শুক্‌না পাতা দিয়া দম্পতির যে শয্যা তৈরী হইয়াছিল।
[7] কাল্যাজ্বর = কালাজ্বর। [8] সামাল = সাবধান, রক্ষা।

আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া ॥
বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ।
এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ ॥"

রজনী হইল শেষ আশমানে মিলায় তারা।
প্রভাতে উঠিয়া দোয়ে[১] বায়রে[২] দিল পারা ॥ ১—৪৬

(২৩)

হুমরার দল

চৌদিগেতে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর।
সন্ধান করিয়া বাদ্যা আইল এত দূর ॥
সামনেতে হুমরা বাদ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা ॥
আক্ষিতে জালিছে তার জলন্ত আগুনি।
নাকের নিশ্বাস তার দেওয়ার[৩] ডাক শুনি ॥
"প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুশ্মনেরে[৪] মার ॥
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ ॥"

"কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি ॥"

"সুজন খেলোয়ার আরে সুন্দর যোয়ান[৫]।
এমন পতি পাইয়া তুমি কি করিলে কাম ॥

[১] দোয়ে = দোহে, দুইজনে। [২] বায়রে = বাহিরে।
[৩] দেওয়ার = মেঘের, (দেব শব্দ হইতে দেওয়া, যথা দেবগর্জন)।
[৪] দুশ্মনেরে = শত্রুকে, নদের চাঁদকে। [৫] যোয়ান = যুবক।

ইয়ার[১] সঙ্গে দিবাম বিয়া দেশে চল যাই।
খুজিয়া হয়রাণ হইলাম তোমারে না পাই॥"

"কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে নারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া॥
আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি[২] যেমন জ্বলে॥
সোণার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা[৩] দেখ॥"

গর্জিয়া উঠে কালা দেওয়া[৪] হাতে লইয়া ছুরি।
মহুয়ার হাতেতে দিল বিষলক্ষের ছুরি॥
একবার চায় কন্যা পালং সইয়ের পানে।
একবার চাহিল কন্যা পতির বদনে॥

"শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে॥
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা॥
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা[৫] হায়॥
ছুট[৬] কালে মা-বাপের কুল[৭] শুন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরে ছিলে চুরি॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম্মদোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায়॥"

*　　*　　*

(মহুয়ার নিজ বক্ষে ছুরিকা-আঘাত ও পতন। হুমরার আদেশে
বেদের দল কর্ত্তৃক নদের চাঁদের প্রাণবধ)

[১] ইয়ার = ইহার। [২] জ্যোনি = জোনাকি পোকা। [৩] ভইরা = ভরিয়া।
[৪] কালা দেওয়া = কালো মেঘ, এখানে হুমরা বেদে।
[৫] আইনাছিলা = আনিয়াছিলা। [৬] ছুট = ছোট। [৭] কুল = কোল।

(২৪)

হুমরার অনুতাপ ; পালঙ্কের স্নেহ

"ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বর।
কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর॥
শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইলা চাও।
একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও॥
আর না ফিরিব আমি আপনার ভবনে।
তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে॥"

হুমরা বাদ্যা ডাক দিয়া কয় "মাইন্‌ক্যা ওরে ভাই।
দেশেতে ফিরিয়া মোর আর কার্য্য নাই॥
কয়বর[১] কাটীয়া দেও মহুয়ারে মাটী।
বাড়ীঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি।
দুইয়েই পাগল ছিল এই দুইয়ের লাগি॥"

হুমরার আদেশে তারা কয়বর কাটীল।
একসঙ্গে দুইজনে মাটী চাপা দিল॥
বিদায় হইল সব যত বাদ্যার দল।
যে যাহার স্থানে গেল শূন্য সেই স্থল॥

রইল তথা পালং সই সুখদুখের সাথী॥
কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিনরাতি॥
অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে॥
চক্ষের জলেতে ভিজায় কয়বরের মাটী।
শোকেতে পাগল কন্যা করে কান্দাকাটী॥
"উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও॥

[১] কয়বর = কবর।

ফিইরা গেছে বাদ্যার দল আর না আইব তারা।
সুখেতে বাধিয়া ঘর কর তুমি বাসা ॥
দুরন্ত দুষমন সেই যত বাদ্যার দল।
তোমারে ছাড়িয়া তারা গিয়াছে সকল ॥
দুইয়ে সইয়ে কুলাকুলি গন্থি[১] ফুলের মালা।
দুইয়ে জনে সাজাইব ঐ না নাগর কালা[২] ॥"

পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা ॥ ১—৩১

[১] গন্থি = গাঁথি।

[২] নাগর কালা = কালিয়া নাগরকে এস্থলে, নদের চাঁদকে।